ছেলেদের আসর

১লা আশ্বিন ১৩৫৫

درختهای انار هم هست گرداگرد حوض تمام سبزه زار
جای عشرت باغ همین است در وقت زرد شدن نارنجها بسیار

ছোটদের বাবর

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রায় পাঁচশো বছর আগের কাহিনী। সুদূর তুর্কীস্থানের মধ্যে ছোট একটি পার্ব্বত্য রাজ্য—নাম তার ফরগণা। তার উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে দুর্ভেদ্য পাহাড় শ্রেণী—কেবলমাত্র পশ্চিমে সুন্দর সবুজ সমতল ভূমি। পাহাড়ে দেশ হলেও ফরগণা শস্য শ্যামলা। আঙ্গুর আর ডালিম, তরমুজ আর খোবানি তার মাঠে মাঠে অপর্য্যাপ্ত ফলে থাকত। স্রোতস্বিনী নদী উর্ব্বরা করে তুলেছিল সমস্ত দেশটিকে। তার তীরে তীরে মনোহর পুষ্পোদ্যান —সেখানে পাশাপাশি ফুটেছে গোলাপ আর বনফুল। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের বুকে চন্দ্রাতপ রচনা করেছে পাইন আর দেবদারু। পরিশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য বিছানো রয়েছে ছায়ানিবিড় আশ্রয়, সুমিষ্ট ফল আর স্বচ্ছ নদীর জল। ফরগণার বনে বনে কত পাখী আর পশুর বিচিত্র সমাবেশ। সাদা হরিণ, পাহাড়ী ছাগল আর খরগোসের ক্রীড়াভূমি এই ফরগণা। অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল সরল সহজ আর

আড়ম্বরহীন। ছোট দেশ ফরগণা—আর তার রাজা হ'ল একটি কিশোর। চোখে তার বীরত্বের প্রতিভা, দেহে তার দুর্ব্বার শক্তি। নাম জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। বয়স তার মাত্র বারো বৎসর। পিতৃবংশ তাঁর তৈমুর লঙ্‌ থেকে উদ্ভূত—জননী ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ মোগল নেতা চেঙ্গীস খাঁর বংশের মেয়ে। বীরত্ব ও শৌর্য্যের এই দুইটি শ্রেষ্ঠ ধারা এসে মিলেছিল বাবরের দেহে। বিপদ ছিল তাঁর আবাল্য সহচর। ফরগণার ছোট সিংহাসনখানি নিয়েই সুরু হয়েছিল সেই বিপদের খেলা - তারই সঙ্গে লড়াই করে তিনি পেয়েছিলেন হিন্দুস্থানের স্বর্ণসিংহাসন। তাই তাঁর জীবনকাহিনী এত রহস্যময়—এত সুন্দর।

বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জ্জা ছিলেন উচ্চাভিলাষী রাজা। পূর্ব্বপুরুষ তৈমুর লঙের সমরখন্দের সিংহাসনে ছিল তাঁর ন্যায়-সঙ্গত দাবী ও অধিকার। কিন্তু সমরখন্দের সিংহাসনে তখন বাবরের পিতৃব্য সুলতান আহমেদ মির্জ্জা অধিষ্ঠিত। উমর শেখের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই ঘটত তাঁদের মধ্যে। এমনই এক দিনে শোনা গেল যে আহমেদ মির্জ্জা বাবরের মাতুল মোগল নেতা সুলতান মহম্মদ খানের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফরগণা আক্রমণের উদ্যোগ করছেন। ফরগণা ছোট রাজ্য—এই দুই প্রবল শত্রুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না, তবুও উমর শেখ প্রস্তুত হচ্ছিলেন এই বিপদকে প্রতিহত করবার জন্য। কিন্তু এমন সময়ে ঘটলো এক আকস্মিক দুর্ঘটনা, আক্‌সী দুর্গের শিখর থেকে পদস্খলিত হয়ে পড়ে গেলেন উমর শেখ—আর তারই ফলে ঘটল তাঁর মৃত্যু! বাবরের বয়স তখন মাত্র বারো বৎসর।

উমর শেখ মির্জ্জা।

বাবর তখন আন্দিজান নগরে উদ্যান পরিবেষ্টিত প্রাসাদে দিন কাটাচ্ছিলেন। ফরগণার যে সাতটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল আন্দিজান তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। উমর শেখ বাবরকে এর শাসন-ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত তিনি এসে উপস্থিত হলেন আক্সী দুর্গে—পিছনে এলো তাঁর সৈন্যদল। কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করার আগে তাঁর মনে দ্বিধা জাগল, হয়তো বা দুর্গের আমীররা ইতিমধ্যে শত্রুদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, হয়তো বাবরকে তাঁরা শত্রুর হাতে সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাবর বাইরে অপেক্ষা করার উদ্যোগ করতে লাগলেন। এই সংবাদ জানতে পেলেন দুর্গের প্রধানেরা। তাঁরা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসী দূত পাঠালেন বাবরের কাছে তাঁদের বিশ্বস্ততার কথা জানিয়ে। মহা সমারোহের সঙ্গে বাবরকে তাঁরা দুর্গে আহ্বান জানালেন। বাবর নিঃসন্দেহ হয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই তিনি ডাকলেন এক পরামর্শ সভা। সমবেত হলেন সেখানে দুর্গের প্রধান আমীররা। অনেক পরামর্শের পর স্থির হ'ল সমস্ত শক্তির বিনিময়ে দুর্গকে রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু তার আগে একটা আপোষ করা সম্ভব কিনা তারই চেষ্টা করা হবে স্থির হল। বাবর তাঁর পিতৃব্য সুলতান আহমেদ মির্জ্জার কাছে একখানি চিঠি পাঠালেন। তাতে বাবর জানালেন যে আহমেদ মির্জ্জার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে তাঁর কোনই আপত্তি নেই কারণ বাবর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্নেহের পাত্র। আহমেদ মির্জ্জা কিন্তু বাবরের এই পত্রে সন্তুষ্ট হলেন না। বাবরকে অত্যন্ত রূঢ়

ভাষায় তিনি অপমান করে চিঠির উত্তর দেন। এই অপমানের প্রত্যুত্তরে বাবর তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। বাবরের সৈন্য ও অর্থবল কিছুই ছিলনা বলা যেতে পারে। তবুও বারো বৎসরের কিশোর ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করার কথা চিন্তা করলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর তাঁকে জয়যুক্ত করবেনই। তাঁর এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের পুরস্কার মিলল। কয়েকটি দৈব দুর্বিপাকে মির্জ্জার সৈন্যদল বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। স্রোতস্বতী কাবা নদীর পরে ছিল হাল্কা একটি সেতু। বিপুল সৈন্য সংখ্যা একসঙ্গে সেই হাল্কা সেতুর পরে আরোহণ করায় সেতু ভেঙ্গে পড়ল নদীর জলে। দুরন্ত পাহাড়ী নদীর স্রোতে ভেসে গেল সৈন্যদল। অবশিষ্ট যারা তখনও বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে দেখা দিল এক সংক্রামক রোগ। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় মির্জ্জা বাবরের দৃঢ়সঙ্কল্প সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস পেলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন সমরখন্দে।

এই অবসরে বাবর ফরগণায় শাসন-শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করেন। আন্দিজানের শাসনভার ও রাজদরবারের প্রধান ক্ষমতা বাবর তাঁর পিতার আমলের বিশ্বাসী আমীর হাসান ইয়াকুবের পরে অর্পণ করেন।

সমরখন্দে এই সময়ে সুলতান আহমেদ মির্জ্জা মারা যাওয়ায় তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ মির্জ্জা সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসবার অল্প পরেই মাহমুদ মির্জ্জা

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে রাজদূত পাঠালেন বাবরের কাছে। ফরগণার রাজদরবারে বাবর তাঁকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এই রাজদূতের গোপন উদ্দেশ্য ছিল অর্থের প্রলোভনে হাসান ইয়াকুবকে বশীভূত করে বাবরকে সিংহাসনচ্যুত করা। ইয়াকুব এই প্রলোভন জয় করতে পারলেন না। রাজদূত সমরখন্দে ফিরে যাবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ইয়াকুবের আচরণ বাবরের চোখে সন্দেহজনক বলে মনে হ'ল। ক্রমে বাবর বুঝতে পারলেন যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁর ছোটভাই জাহাঙ্গীর মির্জ্জাকে সিংহাসনে বসানোই তাঁর উদ্দেশ্য। বাবরের পিতামহী তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ও অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী ছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বাবরের কর্ম্মজীবন বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁরই নির্দ্দেশে পরিচালিত হত। পিতামহীর পরামর্শমত বাবর হাসান ইয়াকুবকে কর্ম্মচ্যুত করার জন্য ইয়াকুবের দুর্গে এসে উপস্থিত হলেন। ইয়াকুব দুর্গের বাইরে ছিলেন শিকারের জন্য। দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তনের পথেই তিনি বাবরের উপস্থিতির কথা জানতে পারলেন। বাবরের উদ্দেশ্য বুঝতে তাঁর দেরী হ'লনা, অশ্বের মুখ ফিরিয়ে তিনি সমরখন্দের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু সমরখন্দে পৌঁছবার আগেই বাবরের সৈন্যের হাতে তিনি নিহত হলেন।

সমরখন্দে এই সময়ে দেখা দিল আবার এক পরিবর্ত্তন। মাহ্‌মুদ মির্জ্জা মারা গেলেন। যোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁর কেউ ছিল না। তাঁর আমীরদের মধ্যে শৌর্য্য ও বীরত্বে শ্রেষ্ঠ ছিলেন খসরু শাহ। ইনি প্রথমে ক্রীতদাসরূপে জীবন স্থুরু করেছিলেন।

পরে আপন প্রতিভা ও বীরত্বে ইনি মাহ্‌মুদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। মাহ্‌মুদ খসরু শাহ্‌কে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ক্রমে তাঁর অধীনে প্রায় পাঁচ সাত হাজার সৈন্য নিযুক্ত হয় এবং তিনি রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।

মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পরে খসরু শাহ্‌ তাঁর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখে তাঁর রাজ্য ও সিংহাসন অধিকার করবার উদ্যোগ করতে থাকেন। কিন্তু মৃত্যুর সংবাদ দীর্ঘদিন গোপনে রাখা সম্ভবপর হল না। সমরখন্দের অধিবাসীরা অনতিবিলম্বেই ব্যাপারটি জানতে পারে। সেদিন খসরু শাহ্‌ রাজ্যে এক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তারই সুযোগে প্রজারা আক্রমণ করল খসরু শাহ্‌কে। সহসা আক্রান্ত হয়ে খসরু বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সহায়সম্বলহীন হয়ে পলায়ন করলেন হিসারের পথে। বোখারায় এই সময়ে মৃত সুলতানের এক পুত্র বৈসুংগর মির্জ্জা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পিতার বিরুদ্ধাচরণ করায় পিতৃস্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন এবং পিতার মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। খসরু শাহের পলায়নের পরে বৈসুংগর মির্জ্জা এ সুযোগ হারালেন না। তিনি সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। বাবর ফরগণা থেকে সমরখন্দের এই অন্তর্বিপ্লবের গতি লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর অধীনে ছিল 'জাগ্রে' নামে পরিচিত এক দুরন্ত পাহাড়ী জাতি। তাদের সাহায্যে তিনি সমরখন্দের সিংহাসন অধিকারের পরিকল্পনা করছিলেন। সুযোগের জন্য বেশীদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হল না। বৈসুংগর

সমরখন্দের অধিবাসী ও সেনানায়কদের সঙ্গে বিশেষ দুর্ব্যবহার করছিলেন। সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। অবশেষে বৈসুংগর তাঁর বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। বাবর সুযোগ বুঝে তাঁর সৈন্যদলসহ সমরখন্দের কিছুদূরে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। বাবর দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে রইলেন সেখানে—ক্রমে আশেপাশের স্থানগুলি বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। দীর্ঘ সাতমাস অবরোধের পরে সমরখন্দের অধিবাসীরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে বৈসুংগর কয়েকশত সৈন্যসহ গোপনে সমরখন্দ পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন। বাবর এই সংবাদ শোনা মাত্র সমরখন্দে প্রবেশ করলেন—সমরখন্দের অধিবাসীরা তাদের প্রকৃত সম্রাটকে বিপুল উল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল।

সে যুগে সমরখন্দ ছিল অত্যন্ত সুন্দর নগর। তৈমুরের নির্দ্দেশে নির্ম্মিত হয়েছিল সেখানে কত প্রাসাদ—কত সুন্দর উদ্যান। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল 'গোক-সরাই' প্রাসাদটি। দুটি বিষয়ের জন্য এই প্রাসাদটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল। তৈমুর-বংশীয় কেউ যখন সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করতেন—তখন তাঁর অভিষেক উৎসব এখানে সম্পন্ন হ'ত। আবার সমরখন্দের সিংহাসনের জন্য যাঁরা অন্যায় ভাবে কামনা করতেন তাঁদের হত্যাকার্য্যও এখানেই হ'ত। পাথরে তৈরী এক সুবৃহৎ মসজিদ ছিল এখানে। এর নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য হিন্দুস্থান থেকে সুদক্ষ ভাস্কর আনানো হয়েছিল—একথা বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। এর একটি প্রাসাদের প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত

ছিল নানা বিচিত্র চিত্র সম্ভার। তৈমুরের সঙ্গে হিন্দুস্থান বাসীদের যুদ্ধের বিচিত্র ইতিহাস তাদের বুকে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। দুর্গের বাইরে পুষ্পোদ্যানে ছিল তৈমুরের সমাধি।

সমরখন্দের আর একটি প্রাসাদে ছিল সে যুগের মান মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বাবর এই মানমন্দির দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

সমরখন্দ তখনকার যুগে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। সবরকমের ব্যবসা ও বাণিজ্যের অবাধ প্রসার ছিল এখানে। এখানকার তৈরী কাগজ ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সমরখন্দের প্রদেশগুলির মধ্যে বোখারা ছিল সব চেয়ে বড়। এর ফল—বিশেষ করে তরমুজ ছিল চমৎকার। কোথাও তার তুলনা ছিল না। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাবরের সৌন্দর্য্য পিয়াসী মনকে সহজেই জয় করে নিল।

সুজলা সুফলা দেশ- তার সুন্দর আবহাওয়া—অধিবাসীদের সহজ সরল জীবন যাত্রা বাবরকে মুগ্ধ করল।

সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ ক'রে পুরাণো ওম্‌রাহ্‌দের সঙ্গে বাবর অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেন। তাঁর প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী সৈন্যরা যথেষ্ট পুরস্কৃত হল। তাঁর অনুচরদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র ছিলেন সুলতান তম্বল। বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে তিনি বাবরের অন্তরকে জয় করেছিলেন। বাবর তাঁকে সবচেয়ে বেশী পুরস্কারে সম্মানিত করেন। কিন্তু সমরখন্দ বিজয়ের আনন্দ বেশীদিন বাবরের অদৃষ্টে ছিল না। দীর্ঘ সাতমাস অবরোধের পরে সমরখন্দের অধিবাসীরা দুর্দ্দশার চরম পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবর যখন সসৈন্যে প্রবেশ করলেন

সমরখন্দের দুর্গে তখন আহার্য্যের অভাবে সমরখন্দ অধিবাসীরা মৃতপ্রায়। সুতরাং বাবর তাঁর সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য থেকে তাদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতে লাগলেন। এদিকে বাবরের সৈন্যদল দীর্ঘদিন গৃহ থেকে অনুপস্থিত থাকায় তাদের ভিতরে দেশে ফিরবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দিল। সমরখন্দ বিজয়ে তাদের কোন উৎসাহ প্রকাশ পেল না। কারণ—সমরখন্দ তখন দুর্দ্দশাপন্ন—দুর্ভিক্ষের সাড়া পড়েছে সেখানে। কাজেই একে একে তারা ফিরতে লাগল তাদের বাড়ীর দিকে। ক্রমে সেনানায়কেরাও এই প্রত্যাবর্ত্তনের দলে যোগ দিলেন। বাবরের সাহায্যকারী মোগল সৈন্যরাও ফিরল। অবশেষে বাবরের প্রিয়পাত্র সুলতান তম্বলও ফিরে গেলেন। ফরগণায় ফিরে গিয়ে তম্বল ও বাবরের অন্যান্য অনুচরেরা বাবরের ছোটভাই জাহাঙ্গীর মির্জ্জাকে ফরগণার সিংহাসনে স্থাপন করার উদ্যোগ করতে লাগলেন এবং এ বিষয়ে বাবরের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। সমরখন্দে বাবরের অনুরক্ত অনুচরদের সংখ্যা তখন কেবলমাত্র এক হাজার। আর সবাই তাঁর পক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছে। বাবর তম্বল ও অন্যান্য সেনানায়কদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানালেন। তখন তাঁরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাবরের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল এক বৃহৎ বাহিনী। তারা সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল বাবরের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাঙ্গীর মির্জ্জাকে নিয়ে তারা আন্দিজান অবরোধ করল। আন্দিজানের শাসনকর্ত্তা বাবরের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে

অবরোধ অত্যন্ত কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বাবরের উপস্থিতি অনতিবিলম্বে প্রয়োজন।

বাবর এই সময়ে অত্যন্ত সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে প্রকাশ পায় যে বাবর জীবিত নেই—আতঙ্কিত ও উপায়হীন হয়ে আন্দিজানের শাসনকর্ত্তা শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আত্মসমর্পণের পরের দিনই বাবর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। কিন্তু তখন বিলম্ব হয়ে গেছে। আন্দিজান নগরী শত্রু অধিকৃত। ওদিকে বাবরের অনুপস্থিতির সুযোগে সুলতান মাহমুদ আলি সমরখন্দ অধিকার করে নিলেন। এইভাবে দু'দিক থেকেই বাবর বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আন্দিজান রক্ষার জন্য তিনি সমরখন্দকে পরিত্যাগ করে এলেন কিন্তু আন্দিজান রক্ষা তিনি করতে পারলেন না। সমরখন্দে ও তাঁর একশত দিনের রাজত্বের অবসান ঘটলো। বাবর বারবার তাঁর হারাণো রাজ্য ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। ক্রমে তাঁর অনুচরেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে যেতে লাগল। তাঁর সেনানায়ক ও সৈন্যদের অধিকাংশের আত্মীয় স্বজন ছিলেন আন্দিজানে। আন্দিজানের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নেই দেখে তাঁরা ক্রমে বাবরকে পরিত্যাগ করে শত্রুপক্ষে গিয়ে মিলিত হতে লাগলেন। সমস্ত দুঃখ ও বিপদকে তুচ্ছ করে বাবরের সঙ্গে রইল কেবল মাত্র শ' দুয়েক সৈন্য। তারা বাবরের জন্য মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। রাজ্যহীন বাবরের দিন এই সময়ে অত্যন্ত বিষন্নতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। সমরখন্দ বিজয়ী

বাবর দারিদ্র্য ও অপমানের চরমে এসে দাঁড়ালেন। কতদিন তাঁর এই সময়ে চোখের জলে কেটে গেছে তা' তাঁর জীবনী পড়লে বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু হতাশ হয়ে অলস ভাবে দিন কাটানো তাঁর স্বভাব ছিলনা। তিনি লিখেছেন "বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয়ের এক গভীর কামনা আমার প্রাণে অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখার মত জ্বলত তুচ্ছ দু'একটা পরাজয়ে আমার উদ্যম নষ্ট হ'তে পারে না। একবার হয়তো জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি—কিন্তু তাতে কি আসে যায়। আমার অদম্য ইচ্ছা আর অসাধারণ সাহস আমার মনে অপরাজেয় শক্তি দান করবে।"

এই দুর্দ্দিনে অবশেষে রাজ্যহীন বাবর আত্মগোপন করলেন আইলাক্ পর্ব্বত শ্রেণীর পিছনে। তাঁর আপন আত্মীয় স্বজন কেউই তাঁকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না। আইলাক পর্ব্বত উপত্যকার মেষপালকদের সঙ্গে তাঁর দিন কাটতে লাগল সেই দুইশত সঙ্গী নিয়ে। রাজ্য, সিংহাসন আর যুদ্ধের কাহিনী ক্রমে সেই কিশোরের চোখে স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে এল। কিন্তু একদিন অপরাহ্ণে বাবরের মনে সহসা তাঁর ফেলে আসা জীবনের জন্য গভীর ব্যাকুলতা জেগে উঠল—পর্ব্বত উপত্যকার নির্জ্জন প্রান্তরে বসে তিনি একান্তভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন ঈশ্বরের কাছে। রাজার পুত্র তিনি—নিজেও তিনি রাজা—তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'ল সিংহাসন অথবা সমরাঙ্গণ—এ কোথায় তিনি জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন সামান্য কৃষক ছেলের মত! বাবর একান্তভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন—অবশেষে

বহুক্ষণ প্রার্থনার পরে তাঁর মন ক্রমে শান্ত হয়ে এল। তিনি প্রার্থনা সমাপ্ত ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। এমনই সময়ে দূরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনি জাগল দ্রুত অশ্বখুরের। বাবর উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতে লাগলেন সেই শব্দ। কিছুপরেই তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল সুসজ্জিত এক অনুচর। সুসংবাদ বহন ক'রে এনেছে সে। আন্দিজানের যে শাসনকর্ত্তা বাবরের উপস্থিতির বিলম্বে শত্রুর হাতে দুর্গ সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, শত্রুপক্ষ পুরস্কার হিসাবে তাঁকে একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করেছিল। তিনি এতদিন পরে অনুতপ্ত হয়ে বাবরের কাছে গোপনে সংবাদ প্রেরণ করেছেন যে যদি বাবর তাঁকে মার্জ্জনা করেন তবে তিনি বাবরের হাতে সেই প্রদেশের শাসন ভার অর্পণ করতে রাজী আছেন সানন্দে।

বাবর আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করলেন না। পঞ্চদশ বৎসরের কিশোর তৎক্ষণাৎ তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করে ফেল্লেন। তখন সূর্য্য অস্তে চলেছে। অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান আলো উপত্যকার পরে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলো অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে তাঁদের যাত্রা সুরু হল। সমস্ত রাত্রি কেটে গেল—তীব্র গতিতে অশ্ব ছুটে চলেছে। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তাঁরা থামলেন-অশ্বের বিশ্রাম প্রয়োজন। আবার গভীর রাত্রে সুরু হ'ল তাঁদের চলা—সমস্ত রাত্রি---সমস্ত দিন চলার পরে সন্ধ্যায় তাঁদের বিশ্রাম—আবার সারারাত্রি চলবার পরে পরদিন প্রভাতে দেখা গেল তাঁরা সেই প্রদেশটির সীমান্তে এসে পৌঁছেচেন। ক্রমে এসে পঁাছুলেন তাঁরা দুর্গের কাছে। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে

আসবার পরে সর্ব্বপ্রথম এইখানে বাবরের মনে হল কে জানে শাসনকর্ত্তার এ আমন্ত্রণ ষড়যন্ত্র কিনা? হয়তো বা শত্রু পক্ষের হাতে বাবরকে তুলে দেবার জন্যই তাঁর এই কৌশল। কিন্তু উপায়·কী? তিন দিন আর তিন রাত্রি ধরে অশ্ব ছুটিয়ে তিনি যেখানে এসে পড়েছেন সেখান থেকে পিছনে ফিরবার কোন পথই তাঁর নেই। অশ্বের আর চলবার শক্তি নেই—তাঁর নিজের দেহেও নেই বিন্দুমাত্র ক্ষমতা। কাজেই বাবরের অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। অদৃষ্টে যাই থাক তিনি এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। নিজের বীর্য্য ও শক্তির পরে নির্ভর ক'রে নির্ভীক ভাবে বাবর প্রবেশ করলেন দুর্গে। তাঁর নির্ভীকতার পুরস্কার মিলল—দুর্গস্বামী সসৈন্যে এসে বাবরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। বাবর আবার আশ্রয় পেলেন দুর্গের দৃঢ় প্রাচীরের আড়ালে—ক্রমে তাঁর দুর্দ্দিনের সহচর সেই দুইশত সঙ্গীও এসে পৌঁছুলো সেখানে। এই প্রত্যাবর্ত্তন বাবরের অদৃষ্টে এনে দিল পরিবর্ত্তন। ফরগণার জনসাধারণ তখন দীর্ঘদিন বিদেশীদের প্রভুত্বে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে—তারা সাগ্রহে বাবরের প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করছিল। ক্রমে প্রত্যেকটি নগরের অধিবাসীরা এসে যোগ দিল বাবরের দলে। আন্দিজান বাবরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিল। শত্রুপক্ষের সব চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে ফরগণা তার সিংহাসনে বসালো তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে।

বিদ্রোহ সাময়িক ভাবে প্রশমিত হল। বাবর রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর একটি সামান্য ভুলের জন্য তিনি আবার বিপদগ্রস্ত হয়ে

পড়েন। বাবরের অনুগত সৈন্যদের মধ্যে কয়েক সহস্র মোগল সৈন্য ছিল। মোগলরা স্বভাবতঃই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর ছিল। তারা বিজিত গ্রামে গ্রামে লুণ্ঠন আর হত্যাকার্য্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করল। বাবর এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মোগল সৈন্যদের দমন করার জন্য আদেশ দিলেন। এ আদেশ প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী সৈন্যদলের। কিন্তু বাবরের তেমন শক্তিশালী সৈন্যদল ছিল না। তাঁর সৈন্যদলের অধিকাংশই ছিল মোগলদের দ্বারা গঠিত। এই আদেশের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে দেরী হল না। বিদ্রোহী মোগল সৈন্যরা হাজারে হাজারে বাবরের পক্ষ পরিত্যাগ করে যোগ দিল তম্বলের সৈন্যদলে। বাবর বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

মোগল সৈন্যের যোগদানে তম্বলের শক্তি বেড়ে গেল, তিনি আবার বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বাবর তাঁর সামান্য সৈন্য নিয়ে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। উভয় পক্ষেই চলতে লাগল জয়পরাজয়ের পালা। অবশেষে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বাবর তম্বলের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছেড়ে দিতে হল তাঁকে তম্বল পরিচালিত তাঁর ছোট ভাই জাহাঙ্গীর মির্জ্জাকে। পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হল। বাবরের পক্ষে এই শতাব্দী অত্যন্ত অশুভ হয়েই কেটেছে। অদৃষ্টের চক্র তাঁর ক্রমেই নেমে চলেছে। কেবলমাত্র অটুট রইল বাবরের দুর্জ্জয় মানসিক শক্তি—তাঁর গাম্ভীর্য্য—তাঁর রাজোচিত বীরত্ব আর শৌর্য্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবার পরেই বাবর সমরখন্দ অধিকারের চেষ্টায় মনোনিবেশ করলেন। দুঃখের দিনেও সুখস্বপ্নের মত বাবরের মনে জেগে উঠত সমরখন্দের একশত দিনের গৌরবময় রাজত্ব। পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরের সিংহাসন দূর থেকে বারংবার তাঁকে আহ্বান করেছে। তার দুর্নিবার আকর্ষণকে তিনি কিছুতেই এড়াতে পারতেন না। শত্রু পরিবেষ্টিত ফরগণা তাঁর কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল—দুর্গের ভিতরে বাহিরে তখন তাঁর বিরুদ্ধে চলেছে ষড়যন্ত্র। দুর্গের প্রধানদের হাতে বাবর তখন খেলার পুতুল। বিদ্রোহের উপায় নেই, নদীর অপর পারেই প্রতীক্ষা করছে তম্বলের সৈন্যবাহিনী। সুযোগ অন্বেষণ করছে তারা বাবরের দুর্ব্বলতার। সেই জন্য প্রতিনিয়ত নীরবে বাবরকে সহ্য করতে হয়েছে নিরুপায়তার গ্লানি।

ঠিক এই সময়েই এল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত সমরখন্দ থেকে আহ্বান। সমরখন্দে তখন রাজা সুলতান আলি। সমরখন্দের পুরাণো আমীর বংশের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ঘটেছিল। সুলতান আলির আদেশে তাঁরা বিদ্রোহী বলে পরিগণিত হলেন এবং তাঁদের বিতাড়িত করা হল সমরখন্দের বাইরে। বিতাড়িত এই আত্মীয় দলের মনে পড়ল বাবরকে—নির্ভীক যোদ্ধা সেই কিশোর—যে মাত্র একশত দিন রাজত্ব করেছিল সমরখন্দের সিংহাসনে। আবার তাঁকে সমরখন্দের সিংহাসনে বসাবার

উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন তাঁরা। তৈমুরের সিংহাসন জয়ের জন্য আহ্বান করলেন বাবরকে। বাবর সাগ্রহ চিত্তে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং অবিলম্বে যাত্রা করলেন সমরখন্দের উদ্দেশে। কিন্তু এত সহজে বাবরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। বাবরের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য সুলতান আলি ইতিমধ্যে দুর্দ্ধর্ষ উজবেগ নেতা শৈবানিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বাবরের চোখের সম্মুখেই তিনি সসৈন্যে এসে প্রবেশ করলেন সমরখন্দে মিত্র হিসাবে। কিন্তু সমরখন্দে প্রবেশের পরেই শৈবানি তাঁর মিত্রতার মুখোস খুলে ফেল্লেন। তাঁর নিষ্ঠুর নির্দ্দেশে সুলতান আলি নিহত হলেন। শৈবানি অধিকার করলেন সমরখন্দের সিংহাসন।

বাবরের অদৃষ্টে আবার দুর্দ্দিনের মেঘ এসে দেখা দিল। ধীরে ধীরে তাঁর সৈন্যরা তাঁকে আবার পরিত্যাগ করতে সুরু করল। যাঁরা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে সমরখন্দ অভিযানে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁরাও তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে নিজের নিজের ভাগ্য অন্বেষণের জন্য চলে গেলেন। বাবর ফরগণায় ফিরে যেতে পারলেন না—তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগে তম্বল তাঁর রাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। সমরখন্দ তাঁর ভীষণ শত্রু। আবার সেই উপায়হীন অদৃষ্ট বিড়ম্বিত কিশোর তার পরিচিত আইলাক পর্ব্বত উপত্যকায় ফিরে গেল। সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে দুর্গম পথ—দুস্তর নদী প্রান্তর—সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বাবর আইলাকে এসে পৌঁছুলেন।

ভাগ্য অন্বেষণকারী এই নবীন যোদ্ধার মন তখনও অসীম

উৎসাহ ও আশায় পরিপূর্ণ। মাত্র কয়েকজন সাহসী সৈন্য নিয়ে যে কোনও দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য সে প্রস্তুত। আইলাক পর্ব্বত উপত্যকায় বাবর তাঁর সৈন্যদের আহ্বান করে পরামর্শ করলেন কি করা উচিৎ। কয়েকদিন ধরে গভীর পরামর্শের পরে তাঁরা আবার সমরখন্দে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত বলে মনে করলেন। বাবরের সৈন্যসংখ্যা তখন নিতান্তই অল্প—কিন্তু তবুও সমরখন্দ আক্রমণ করার পক্ষে এই সময়ই তাঁর কাছে সবচেয়ে শুভ সুযোগ বলে মনে হল। শৈবানির ক্ষমতা সমরখন্দে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই আঘাত করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে তিনি মনে করলেন। সুলতান আলিকে হত্যা করা, সমরখন্দের জ্ঞানী ও সাধুদের নির্ব্বাসিত করা প্রভৃতি কাজের দ্বারা শৈবানি সমরখন্দের প্রজাদের বিরাগ ভাজন হয়ে উঠেছে! প্রজাদের সে অসন্তোষ দূর করার সময় ও সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না। বাবর তার আগেই আক্রমণ করবেন শৈবানিকে। সমরখন্দের বাইরে তিনি তাঁর শিবির ফেল্লেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যদি কোনও রকমে তিনি সমরখন্দে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন তবে সমরখন্দের প্রজাবৃন্দ সেই মুহূর্ত্তেই তাঁকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

নগরের সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করার জন্য বাবর গভীর রাত্রে চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল বটে কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও নিরুৎসাহ হলেন না। অবশেষে নবেম্বরের শীতের রাত্রে সমরখন্দের প্রহরীরা যখন নিদ্রাতুর তখন বাবরের দুঃসাহসী সৈন্যদলের প্রায় আশী জন

নিঃশব্দে প্রাচীর অতিক্রম করে নগরের সিংহদ্বার খুলে দিল—সেখানে বাবর তাঁর অবশিষ্ট অনুচরদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। দ্রুতগতিতে তাঁরা সকলে প্রবেশ করলেন নগরে, সমস্ত নগর তখন নিদ্রামগ্ন। কেবলমাত্র কয়েকজন দোকানী দোকানের ঝাঁপ তুলে দেখ্‌ল বাবরের নিঃশব্দ প্রবেশ। তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল এই সৌভাগ্যের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই নিদ্রিত নগরের কানে প্রবেশ করল এই সুসংবাদ। উল্লসিত প্রজাবৃন্দ দলে দলে ছুটে এলো বাইরে। সহরের রাস্তায় রাস্তায় উজবেগদের প্রকাশ্যভাবে হত্যা করে তারা তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করল। মাত্র দুশো চল্লিশ জন সৈন্য জয় করল সমরখন্দ। নগরের সিংহদ্বারে বাবর তাঁর আসন গ্রহণ করলেন—দলে দলে লোক এলো তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিতে—সংগ্রহ করে নিয়ে এল তাঁর জন্য খাদ্য আর পানীয়। অবশেষে সৈন্যদের সংহত করে নিয়ে বাবর উজবেগদের আক্রমণ করলেন। শৈবানি এই আকস্মিক আক্রমণের প্রবলতা সহ্য করে উঠতে পারলেন না। তিনি মাত্র একশত সৈন্য নিয়ে পলায়ন করলেন। বাবর তাঁকে অনুসরণ করতে পারলেন না কারণ তাঁর সৈন্য সংখ্যা তখন নিতান্তই সামান্য। শৈবানি নিরাপদে পলায়ন করলেন। সমরখন্দে বাবরের জয়োৎসব সুরু হল। গার্ডেন প্যালেস বা উদ্যান সৌধে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে সমরখন্দ ছিল বাবরের পূর্ব্বপুরুষের অধিকারে। ঈশ্বরের কৃপায় বাবর আবার তাকে অর্জ্জন করলেন নিজের বাহুবল ও বুদ্ধি কৌশলে। বাবরের কাছে এই

সময়ে তাঁর জননী ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলেই নিরাপদে এসে পৌঁছলেন। বাবরের আনন্দের সীমা রইল না।

সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণের পরে বাবর সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্যোগে ব্রতী হলেন। উজবেগদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত হবার জন্যে তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর প্রতিবেশী রাজাদের। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কোনও রাজাই সর্ব্বান্তঃকরণে বাবরের সহযোগিতা করতে সম্মত হলেন না। ফরগণার বর্ত্তমান অধীশ্বর জাহাঙ্গীর মির্জ্জা এবং তাঁর মাতুল মোগল অধিপতি নিতান্ত সামান্য সৈন্য প্রেরণ করলেন তাঁর সাহায্যের জন্য। হিরাটের শক্তিমান অধীশ্বর তৈমুরের বংশধর হোসেন মির্জ্জা তাঁকে কোনও প্রকার সাহায্য করতে সম্মত হলেন না। বাবর ঐকান্তিক ভাবে তাঁর নিজের শক্তি-বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করলেন। সমরখন্দের সমস্ত জনপদ ও নগরে ক্রমে শক্তির সাড়া দেখা গেল। এই শক্তির সাহায্যে বাবর তাঁর পরম শত্রু উজবেগ নেতা শৈবানিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ধ্বংস করার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু কূট বুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সৈন্যশক্তিতে শৈবানি বাবরের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলেন। তাদের দুরন্ত প্রতি-আক্রমণে বাবর ক্রমশঃই পশ্চাতে সরে আসতে বাধ্য হলেন। উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে ভীষণ ভাবে পরাজিত হলেন বাবর। ইতিমধ্যে আর এক নূতন বিপদে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর অধীনস্থ মোগল সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা

করে সহসা তাঁর সৈন্যদলকে আক্রমণ করল। তাদের লুণ্ঠন ও হত্যাকার্য্যে বাবর অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদগ্রস্ত হলেন। অবশেষে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে সমরখন্দে ফিরে গেলেন। উৎসাহিত উজবেগ সৈন্যদলকে পরিচালিত করে শৈবানি এসে উপস্থিত হলেন সমরখন্দের কাছে। তারপরে আরম্ভ হল সুদীর্ঘ অবরোধ। তখনকার দিনে নগরের সুউচ্চ প্রাচীর নগর রক্ষার প্রধানতম উপায় ছিল। সমরখন্দের সুদৃঢ় প্রাচীরও তার অধিবাসীদের রক্ষা করতে লাগল শত্রুর কবল থেকে। বাবর সতর্ক প্রহরীর ব্যবস্থা করলেন প্রাচীরের চারিদিকে। বহুবার শৈবানির গভীর নিশীথের নিঃশব্দ ও দুর্ব্বার আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের নিদ্রাহীন সতর্কতার কাছে। গভীর রাত্রে সমরখন্দের ভীত ও সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা শুনতে পেত দূর প্রান্তরের বুকে নির্জ্জনতাকে ভেঙ্গে দিয়ে উজবেগ সৈন্যদের উৎসবের শিঙা আর ভেরীর উল্লাস ধ্বনি—দেখতে পেত অন্ধকার আকাশের বুক রাঙিয়ে দিয়ে জ্বলছে মশালের আগুন। সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠিত হয়ে সমরখন্দবাসীরা অপেক্ষা করত প্রভাতের আলোর। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এই বিভীষিকার মধ্যে তাদের কাটতে লাগল। বাবর আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেলেন না কোনও দিক থেকেই। কোনও দিক থেকেই নেই সাহায্যের আশ্বাস। নিঃশ্বাসরুদ্ধ করে মুক্তির প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে উঠল সবাই। বাবর এই সময়ের কথা লিখেছেন—

"আমার প্রতিবেশী রাজা ও রাজপুত্রদের কাছে সাহায্যের

আবেদন পাঠালাম—কিন্তু কোনও জায়গা থেকেই সাড়া এলো না। অবশ্য আমি যখন আমার সুদিনে তাঁদের কাছে একত্র হবার জন্য বার্ত্তা প্রেরণ করেছিলাম তখনও তাঁরা তাতে সম্মত হননি। কাজেই আজ আমার এই চরম দুর্দ্দিনে তাঁরা যে কেউই আসবেন এগিয়ে সে আশা আমার বিশেষ ছিল না। জ্ঞানীরা বলেন দুর্গ রক্ষার জন্য প্রয়োজন মস্তক, দুই বাহু এবং পদদ্বয়। মস্তক অর্থ নেতা, বাহুযুগল—দুইটী মিত্র সেনার সাহায্য, পদদ্বয় হল খাদ্য ও পানীয়। কিন্তু আমার এই বিপদের দিনে এর কোনটাই ছিল না। কেবলমাত্র আমিই সেই মস্তক অর্থাৎ দুর্গের নেতা। এছাড়া মিত্র সেনার আগমনের কোন আশা নেই—আর খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষ।"

সমগ্র সমরখন্দে খাদ্যকণা কোথাও নেই—দরিদ্রেরা বন্য পশুর মাংসে অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে। অবসন্ন ও হতাশ প্রহরীর প্রহরা এড়িয়ে দলে দলে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করছে দুর্গে রাত্রের অন্ধকারে। অবশেষে আর উপায় নেই দেখে বাবর আবার পলায়ন করলেন সমরখন্দ থেকে গোপনে তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে। গভীর রাত্রে রাজ্য সিংহাসন পরিত্যাগ করে এই যে পলায়ন—বাবর কিন্তু এতেও বিন্দুমাত্র হতাশ হননি কিংবা তাঁর মন ভেঙ্গে পড়েনি। এই অবস্থাতেও আত্মজীবনীতে তিনি যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তাঁর পথের বিবরণ—তাঁর খাদ্যতালিকা কিছুই বাদ পড়েনি। পলায়নের কালে কোথায় চমৎকার সুস্বাদু মাছ—সুমিষ্ট খরমুজা আর রসালো আঙ্গুরের প্রাচুর্য্যে তাঁর দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেহ পরিতৃপ্তি

লাভ করেছিল, খুঁটিনাটি ভাবে তাদের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সময়ে তিনি চমৎকার কয়েকটি কবিতার লাইন লিখেছিলেন—

দুর্ভিক্ষ আর দুর্দ্দশা থেকে শান্তির কোলে আশ্রয় পেয়েছি।
নবজীবন আর নূতন পৃথিবী আমাদের চোখের সম্মুখে।
অন্তর থেকে মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়ে গেছে।
তীব্র ক্ষুধার জ্বালা অপনোদিত হয়েছে আমাদের।

তিনি লিখেছেন—

"আমার সমস্ত জীবনে শান্তি আর প্রাচুর্য্যের এত তৃপ্তি আর কখনও অনুভব করিনি। দুঃখের পরে আনন্দ, অভাবের পরে প্রাচুর্য্য মনে গভীরতর তৃপ্তি দান করে। জীবনে আরও কত-বার এর চেয়েও বেশী বিপদে পড়েছি—কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই প্রথম অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। ক্ষুধার পরে খাদ্য, বিপদের পরে আশ্রয় আমাকে চিরস্মরণীয় আনন্দ দিয়েছিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহায় সম্বলহীন রাজ্যহারা বাবরের জীবনে আবার দুঃখের দিন দেখা দিল। উজবেগ সৈন্যের কাছে তাঁর চরম পরাজয় ঘটল। অভাবের তাড়নায় অনুরক্ত ভৃত্যেরা সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। বাবর নিঃস্ব অবস্থায় আবার পর্ব্বত উপত্যকার মেষপালকদের গৃহে আপনার আশ্রয় খুঁজে নিলেন। উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন সুসময়ের জন্য। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ রইল উজবেগ শক্তির দিকে। বাবরের মনে একটা বিশেষ শক্তি ছিল যে তিনি যে কোনও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে নিতে পারতেন। উপত্যকার সরল ও সহজ অধিবাসীদের সঙ্গে গড়ে উঠল তাঁর হৃদয়ের এক গভীর সম্পর্ক। পারসিক কৃষকদের মেষ আর ঘোটকীর দল চরাতে চরাতে তিনি তাদের সঙ্গে নানা গল্প ও কাহিনীতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়লের বাড়ীতে ছিল তাঁর থাকবার জায়গা, গৃহে সেই মোড়লের অতিবৃদ্ধা মা ছিলেন, ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি আবার তাদের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নিয়ে সর্ব্বসমেত তারা ছিল ছিয়ানব্বই জন। গ্রামের চারিদিকেই ছিল তাদের বসবাস। অবসর সময়ে বাবর সেই বৃদ্ধার কাছে গল্প শুনতেন। ১৩৯৮ সালে যখন তৈমুর হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর। তাঁর এক আত্মীয় তৈমুরের সৈন্যদলে কাজ করত। তারই কাছে শোনা ভারতবর্ষের কাহিনী সেই

বৃদ্ধা শোনাতেন রাজকুমার বাবরকে। হিন্দুস্থানের অপরিসীম সৌন্দর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শুনতে শুনতে কল্পনাপ্রিয় কিশোরের মন ভরে উঠত। চোখের পরে হিন্দুস্থানের পাহাড় পর্ব্বত আর সমুদ্র নদী ঘেরা চমৎকার রূপটি তার চোখে ধরা দিত। নিঃস্ব কিশোর স্বপ্ন দেখত হিন্দুস্থান বিজয়ের।

ক্রমে পর্ব্বত উপত্যকার নির্জ্জনতা ও অলস জীবন তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলল। তিনি এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। এই সময়ে উজবেগদের বিরুদ্ধে তিনি ছোট ছোট কয়েকটি অভিযান চালনা করেছিলেন। কিন্তু কোনটাই সফল হয়ে ওঠেনি।

এর পরে বাবর তাঁর মাতুল মোগল অধিপতি মাহমুদ খানের কাছে আশ্রয় নিলেন। তাঁর রাজ্য ছিল মরুভূমির মধ্যে ছোট একটি দেশ—নাম তার তাসখেন্দ। মাহমুদ খান তাঁকে বিশেষ স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন না। তাঁর মনে হল হয়তো বাবর তাঁর দুর্ভাগ্যের বোঝা এবার তাঁরই মাথায় চাপিয়ে দেবেন। অমঙ্গলের অগ্রদূত রূপেই বাবর তাঁর কাছে প্রতিভাত হলেন। বাবরের তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। দুই লাইন কবিতায় তিনি তাঁর এই সময়ের মনোভাবকে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন :—

পৃথিবীতে আমার আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বিশ্বাসী
বন্ধুর সন্ধান আমি আজও পাইনি
আমার হৃদয় ভিন্ন এমন কাউকেই আমি পাইনি
যার পরে নির্ভর করা চলে।

তিনি এই সময়ে লিখেছেন ঃ—তাসখেন্দএ থাকবার সময়ে আমি অপরিসীম গ্লানি এবং দুঃখভোগ করেছি। রাজ্য জয়ের আশা তখন আর আমার মনে ছিল না। অভাবের তাড়নায় বন্ধুরা, অনুচরেরা পরিত্যাগ করে চলে গেছে আমাকে। নগ্নপদে নগ্ন মস্তকে আমি সকলের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হতাম কারণ কিছুই আমার ছিল না আর। অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠলাম এই জীবনে—যে জীবনে গৃহ নেই—আশ্রয় নেই—নিশ্চিন্ত ও সম্মানজনক খাদ্য নেই। এইভাবে আত্মীয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে অসম্মান ও গ্লানিপূর্ণ জীবন যাপন করার চেয়ে লোকচক্ষুর বাইরে—মানব-সমাজের থেকে অনেকদূরে আত্মগোপন করে থাকা ভাল, যেখানে—কোনও পরিচিত দৃষ্টি আমাকে খুঁজে পাবে না। পিছনে সবাইকে ফেলে রেখে পৃথিবীর সুদূরতম কোণে আপনাকে গোপন করে ফেলা আমার কাম্য হয়ে উঠল।

বহুদিন থেকে বাবরের কামনা ছিল চীন দেশে যাবার। আজ যখন রাজ্য সিংহাসন ও স্বজনদের দ্বারা তিনি পরিত্যক্ত—তখন আর চীনদেশে যাবার কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল না তাঁর। অজ্ঞাতভাবে তিনি চীন পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করলেন। মঙ্গলীস্থানে মাহমুদ খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ খান বাস করতেন। বাবরের সঙ্কল্প ছিল প্রথমে আহমদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তারপরে অজানা পূর্ব্বদিকে তাঁর যাত্রা সুরু করবেন। কিন্তু বাবরের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হতে পারল না। এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল আহমদ খান মঙ্গলীস্থান থেকে তাসখেন্দে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে আসছেন।

বাবরের সঙ্গে আহমদ খানের দেখা হল মরুভূমির মধ্যে। আহমদ খান তাঁর ভাগিনেয়কে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। নানা মূল্যবান উপহার দিলেন তাঁকে, তার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ অশ্ব আর চীনা সিল্কের পরে সোণার ফুলের কাজ করা একটি পরিচ্ছদ বাবরের খুব পছন্দ হয়েছিল। আহমদ খাঁ আর মাহমুদ খানের সঙ্গে দেখা হল। মোগল রীতি অনুযায়ী নানারকম উৎসব করা হল দুই ভ্রাতার এই মিলনকে স্মরণীয় ও সম্মানিত করে রাখবার জন্য। অবশেষে দুই ভ্রাতা অনেক পরামর্শের পরে স্থির করলেন যে উভয়ের মিলিত শক্তির সাহায্যে ফরগণা অঞ্চলে তম্বলের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে উচ্ছেদ করা হবে। খান ভ্রাতারা বাবরকে শত্রু সৈন্যের পশ্চাতে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। বাবর আবার সৈন্যসহ অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন। তাঁর সমস্ত মন বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পথে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি তিনি অতিক্রম করলেন প্রত্যেকটির অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে বাবরের আধিপত্য স্বীকার করে নিল। ক্রমে আন্দিজান নগরের দক্ষিণে সমস্ত জনপদে বাবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। বাবরের মনে বিশ্বাস ছিল যে আন্দিজানের অধিবাসীরা বাবরের অনুগত ছিল। তাই এক দিন গভীর রাত্রে তিনি আন্দিজানের কয়েক মাইল দূরে এসে উপস্থিত হলেন। এই জায়গা থেকে তিনি তাঁর সেনাপতি কাম্বার আলিকে কয়েকজন সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন আন্দিজান দুর্গের সেনানায়কদের কাছে। তাঁরা বাবরের আধিপত্য বিনাযুদ্ধে মেনে নিতে রাজী আছেন

কিনা তাই ছিল তাঁর জিজ্ঞাস্য। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে বাবর উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন কাম্বার আলির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য। বাবর নিজেই এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঃ—

—"রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের অনেকেই তখন নিদ্রাতুর—কেউ বা একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে যুদ্ধের শিঙা আর ভেরী বেজে উঠল। আমার সৈন্যরা নিদ্রা ও ক্লান্তিতে তখন অবসন্ন। শত্রুসৈন্যসংখ্যা জানবার জন্যও তারা অপেক্ষা করতে পারল না। শিঙা আর ভেরীর শব্দে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা বিশৃঙ্খলভাবে যে যেদিকে পারল পলায়নে প্রবৃত্ত হল। তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার সময় আমার ছিল না। ক্ষণপরেই দেখলাম আমরা চারজন ছাড়া আর সবাই পলায়ন করেছে। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম করতেই শত্রুরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল আমাদের দিকে। আমি আমার তীর ধনুকের সাহায্যে শত্রুসৈন্য নিহত করতে লাগলাম কিন্তু তাদের প্রতিহত করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে আমার সাহায্যকারী তিনজন আমাকে বল্ল আমাদের সমস্ত সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়েছে। চারজনের পক্ষে শত্রু প্রতিরোধ করা অসম্ভব। তার চেয়ে আমাদের এখন পলায়ন করাই উচিৎ। পরে সৈন্যসংখ্যাকে একত্র করে আবার শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্যোগ করাই হবে সঙ্গত। আমিও তাদের কথার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলাম, এবং পলাতক সৈন্যদের উদ্দেশে আমাদের অশ্ব পরিচালনা করলাম, কিন্তু বৃথাই।

কোনওক্রমেই তাদের আমরা সমবেত করতে সক্ষম হলাম না। অগত্যা আবার আমরা চারজনে শত্রু আক্রমণের উদ্দেশ্যে ফিরে দাঁড়ালাম। কিন্তু শত্রু যে মুহূর্ত্তে বুঝতে পারল যে আমরা মাত্র চারজন সেই মুহূর্ত্তেই তারা মহা উল্লাসে আমাদের আক্রমণ করার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে লাগল। আমাদের পলাতক সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়েই আমরা চারজন বারবার আমাদের অশ্ব থামিয়ে শত্রু সৈন্যদের তীর নিক্ষেপ করে বিব্রত করতে লাগলাম। আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তারাও তাদের গতি মাঝে মাঝে থামাতে বাধ্য হতে লাগল। কিন্তু এতেও আমি আমার বিশৃঙ্খল সৈন্যদের রক্ষা করতে পারছিলাম না। তারা দলে দলে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত এবং নিহত হতে লাগল।" এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হবার পরে বাবর দেখলেন অনুসরণকারী সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই অল্প। ইতিমধ্যে তাঁর পলাতক সৈন্যদের কিছু কিছুও তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল। তিনি এইবার তাদের পাল্টা আক্রমণ করার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু ভোরের আলোয় দেখা গেল—কী বিষম ভুল হয়ে গেছে গতরাত্রের অন্ধকারে। আক্রমণকারী দল তম্বলের সৈন্য নয়—তারা ছোট একটা মোগল সৈন্যের দল—গোপনে আন্দিজান আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এইভাবে নিজেদের ভুল ধরা পড়ায় হতাশ হয়ে তাঁরা তাঁদের বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

এদিকে তম্বলও হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর সৈন্যরা ধীরে ধীরে বাবরের সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছিল। তম্বলের গোপনে

পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না। বাবর তম্বলের এই হতাশার কারণ জানতে পারলেন এবং এই সুযোগে আবার আন্দিজান অধিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হলেন। বাবরের নিজের ইচ্ছা ছিল অতর্কিতে আন্দিজান সহরে প্রবেশ করার। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে অতর্কিত আক্রমণে আন্দিজান আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু তাঁর সেনানায়কেরা তাঁকে এই বিপদজনক কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে বল্লেন। কিন্তু এখানেই বাবরের ভুল হল। রাত্রির অসতর্ক মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিদ্রিত বাবরের সৈন্যের পরে তম্বল আক্রমণ করলেন প্রচণ্ডভাবে। বাবর এই যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করেছেন—

"কাম্বার আলি চিৎকার করে উঠলেন শত্রু এসেছে। ওঠো জাগো—সমস্ত সৈন্যদল চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আমি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম। ত্রস্তে জেগে উঠে মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। তারপরে আমরা দ্রুতবেগে শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। তখন আমার সঙ্গে মাত্র দশজন সৈন্য। দুর্দ্দান্ত তেজে তীর ধনুকের সাহায্যে অগ্রগামী শত্রুকে প্রতিরোধ করলাম। ক্রমে আমি প্রধান শত্রুদলের সম্মুখে এসে পৌছলাম। সম্মুখেই শতাধিক সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল তম্বল।"

বাবর তাঁর পরম শত্রুকে সম্মুখে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড তেজে তাঁকে আক্রমণ করলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর সৈন্যদল থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই তম্বল এবং

তাঁর সাহায্যকারী সৈন্যদলের আক্রমণ একাকী প্রতিহত করার শক্তি তাঁর ছিল না। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাবর কোনক্রমে পলায়ন করতে সক্ষম হলেন। এইভাবে আন্দিজান উদ্ধারের আশা তাঁর নির্ম্মল হয়ে গেল।

এদিকে খান ভ্রাতাদের ব্যবহারও বাবরের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল। এপর্য্যন্ত যতগুলি জনপদ তিনি অধিকার করেছিলেন তার সবগুলিই তাঁরা দখল করে নিলেন। বাবরকে তাঁরা আশ্বাস দিলেন যে শীঘ্রই তাঁরা সমরখন্দের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ পরিচালনা করবেন এবং বিজিত সমর-খন্দের সিংহাসন বাবরকে দান করবেন, বিনিময়ে ফরগণার আধিপত্য মেনে নেবেন তাঁরা। বাবর তাঁর মাতুলদের এই ছলনা বুঝতে পারলেন। তিনি একথাও জানতেন যে যদি এঁরা সমরখন্দ অধিকারে সক্ষম হন তবে অনায়াসেই তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবেন। কিন্তু বাবর ছিলেন উপায়হীন। প্রতিবাদ করবার মত কোনও ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। কাজেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন সময় ও সুযোগের। বাবরের চরিত্রের এই প্রধান বিশেষত্বই তাঁকে উন্নতির পথে শক্তি দান করেছিল। নিঃশব্দ ধৈর্য্যের সঙ্গে দিনের পর দিন তিনি প্রতীক্ষা করতেন সুযোগের। কোনও কারণেই বিচলিত হয়ে জীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিনষ্ট তিনি করতেন না। প্রতীক্ষা এবং ধৈর্য্যই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে তম্বলের ছোটভাই শেখ বায়াজিদ বাবরকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তখন আক্‌সী দুর্গে বাস করছিলেন। বাবরকে এইভাবে আক্‌সী দুর্গে আহ্বান করার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট ছিল। মোগল সৈন্যাধিপতি খান ভ্রাতাদের সৈন্যপরিচালনার ব্যাপারে বাবরই ছিলেন একমাত্র অভিজ্ঞ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সেনাপতি। তাঁরই নেতৃত্বে মোগল সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল এবং তম্বলের শক্তি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল, কাজেই যদি কোনও প্রলোভনে তাঁকে খান ভ্রাতাদের পক্ষচ্যুত করা যায় তবে ফরগণা মোগল সৈন্যের উপদ্রব থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি পাবে। অন্যদিকে, তম্বলের প্রভাবাধীন বাবরের পক্ষে নূতন উৎসাহে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে একথাও সুনিশ্চিত। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শেখ বায়াজিদ বাবরকে আক্‌সী দুর্গে নিমন্ত্রণ পাঠালেন। এদিকে খান ভ্রাতারাও এই ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হলেন। বাবরকে তাঁরা শেখ বায়াজিদের সঙ্গে মৌখিক বন্ধুত্ব ক'রে গোপনে তার সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বাবর এই পরামর্শ গ্রহণে সম্মত হলেন না। বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র করা বাবরের চরিত্রে স্থান পেতনা। সন্ধি করে কোন স্বার্থের খাতিরে তাকে ভঙ্গ করার কথা বাবর চিন্তা করতে পারতেন না! তবে শেখ বায়াজিদকে নিজের দলভুক্ত করার

চেষ্টা করতে তিনি সম্মত হলেন যাতে তম্বলের শক্তি হ্রাস পায়।

এই ব্যবস্থানুসারে বাবর আক্‌সীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর পিতার পুরানো প্রাসাদে তাঁর আবাসস্থান তিনি স্থির করে নিলেন। বায়াজিদ বাবরের সঙ্গে অত্যন্ত উদার ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে লাগলেন। অবশ্য আক্‌সী দুর্গের কর্ত্তৃত্বভার শেখ বায়াজিদের হাতেই ছিল—বাবর সম্মানিত অতিথির মতই বাস করছিলেন সেখানে—তবু তাঁর মনে বায়াজিদের বিরুদ্ধে কোনও সন্দেহ গড়ে উঠবার অবকাশ এ পর্য্যন্ত হয়নি। এই সময়ে সহসা একদিন বাবর সংবাদ পেলেন যে অতর্কিতভাবে সমরখন্দের উজবেগ অধিপতি শৈবানির আক্রমণে পরাজিত হয়ে তাঁর মাতুল খান ভ্রাতারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। বাবর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। শত্রুপুরীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে তিনি প্রতিক্ষণেই বিপদের আশঙ্কা করতে লাগলেন। এদিকে বাবরের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তম্বল প্রায় দুই তিন হাজার সৈন্য নিয়ে আক্‌সীর দিকে অগ্রসর হলেন বাবরকে বন্দী করার জন্য। এইভাবে বায়াজিদ আর তম্বলের পরিকল্পনা প্রায় সার্থকতায় পরিণত হবার উপক্রম করল। বাবর স্বভাবতই একটু অসতর্ক ছিলেন। মানুষের পরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অফুরন্ত। এই বিশ্বাসপ্রবণতা ও সরলতার জন্যই তিনি বারে বারে বিপদে পড়েছেন। এতদিনে বাবর তাঁর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করলেন। দুর্গের আধিপত্য তাঁর নয়। তাঁর

অনুচরেরাও সকলে বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত প্রদেশটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে কেবলমাত্র একশো জন সৈন্য তখন বর্ত্তমান। এখন কেবলমাত্র নিরাপদে পলায়ন করতে পারাটাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকারী বলে মনে হল। তিনি সেই উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন যখন দুর্গস্বামী বায়াজিদ দুর্গে অনুপস্থিত বাবর সেই সুযোগে পলায়নের উদ্যোগ করলেন। কিন্তু এত সহজে বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া তাঁর ঘটল না। আক্‌সী দুর্গের লৌহদ্বারের সম্মুখে এসে পৌঁছতেই তাঁর দেখা হল শেখ বায়াজিদের সঙ্গে। শেখ বায়াজিদ তখন দুই তিন জন অনুচরসহ ফিরছিলেন। সহসা এইভাবে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়ায় বাবর অব্যর্থ লক্ষ্যে বায়াজিদকে আহত করলেন। আহত বায়াজিদ ভীত হয়ে দুর্গের ভিতরে পলায়ন করলেন। কিন্তু এইভাবে পলায়নের পথ সুগম হওয়াতেও বাবর পলায়ন করতে পারলেন না। সহসা তাঁর মনে পড়ল যে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মির্জ্জা—যিনি বাবরের বিরুদ্ধে তম্বলের সঙ্গে যোগ দিয়ে একসময়ে ফরগণায় আধিপত্যলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—তিনি এইসময়ে শেখ বায়াজিদের প্রাসাদে প্রায় বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বাবর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করলেন প্রাসাদে জাহাঙ্গীরকে সংবাদ দেবার জন্য, এবং নিজে সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে ভ্রাতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি জানতেন এভাবে অপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ নয় কিন্তু তবুও তিনি জাহাঙ্গীরকে

ফেলে পালাতে পারলেন না। অবশেষে বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পরে প্রেরিত দূত এসে সংবাদ দিল যে জাহাঙ্গীর এই গোল-যোগের অবকাশে ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করেছেন। বাবর তখন তাঁর যাত্রা সুরু করলেন। সঙ্গে তখন তাঁর কেবলমাত্র পঁচিশ ত্রিশ জন অনুচর। কিন্তু তখন যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। বাবরের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গের ভিতর থেকে দলে দলে সশস্ত্র সৈন্যদল অশ্বারোহণে দ্রুত তাঁদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হল। বাবর তাঁর অনুচরদের সঙ্গে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে পলায়ন করতে লাগলেন। কিন্তু দ্রুতগামী অশ্বারোহী শত্রু সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে কাছে এসে পড়তে লাগল—বাবরের অনুচরেরা এক-একজন করে তাদের হাতে নিহত হতে লাগল। বাবর তাঁর অনুচরদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর অশ্বের গতিকে সংহত করতে চাইলেন—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে প্রভুভক্ত দুইজন ভৃত্য তাঁর অশ্বের বল্গা সবলে রুদ্ধ করে বাবরকে বলল—পিছন দিকে চাইবার সময় এ নয়—এখনও আমাদের পিছনে ছুটে আসছে শত শত সৈন্য। তাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করা সম্ভব নয়—কাজেই কোনও রকমে পলায়ন করাই বাঁচবার একমাত্র পথ। বাবরও একথা জানতেন যে একমুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করার অর্থ হল নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। কাজেই পলায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। এইভাবে প্রাণপণে ছুটে আক্‌সী থেকে কয়েক মাইল দূরে এক নদীর তীরে যখন এসে তাঁরা পৌঁছলেন তখন পিছনে আর শত্রুসৈন্য দেখা যাচ্ছেনা। ক্লান্ত অশ্বগুলির

মুখ দিয়ে তখন উঠছে ফেণা—আরোহীদের সর্ব্বাঙ্গ ধুলোয় ভরা। সংখ্যায় মাত্র তখন তারা আটজন। পাহাড়ী নদীর জলস্রোত বঙ্কিম হয়ে প্রবেশ করেছে এক উপত্যকায়। বাবর তাঁর সাতজন সঙ্গী নিয়ে সেই উপত্যকার নির্জ্জন বুকে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সারাদিন পরে সন্ধ্যার প্রার্থনার পরে যখন তাঁরা উপত্যকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন দূরে একটা কালো বিন্দু তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাবর তাঁর সঙ্গীদের আড়ালে রেখে একটি পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যা' দেখলেন—তাতে তাঁর সমস্ত মন গভীর হতাশায় ভরে উঠল। দূরে অশ্বারোহীর দল এদিকেই আসছে তাদের অশ্ব ছুটিয়ে। অবিলম্বে বাবর পাহাড় থেকে নেমে তাঁর সঙ্গীদের সবকথা জানিয়ে আবার তাঁদের ক্লান্ত অশ্বগুলির উপরে উঠে বসলেন। আবার তারা ছুটে চল্ল সম্মুখের দিকে। বাবরের প্রধান ভীতির কারণ ছিল যে তিনি জানতেন না তাঁর শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিল কত। পরে তিনি শুনেছিলেন যে অনুসরণকারীদের এই দলে মাত্র কুড়ি পঁচিশ জন সৈন্য ছিল। তিনি বলেছেন যে যদি তিনি সেইসময়ে তাদের সংখ্যা জানতে পারতেন তবে তিনি তাঁর সাতজন সঙ্গী নিয়েই তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অজ্ঞাত সংখ্যক শত্রুদের থেকে দূরে পালানোই তখন তাঁর শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল।

ক্রমেই শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসতে লাগল। বাবর ও তাঁর সঙ্গীদল ক্লান্ত—তাদের অশ্বগুলির বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।

কাজেই তাঁরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। এই সময়ে জনকুলী নামে বাবরের একজন হিতৈষী অনুচর বাবরকে সবচেয়ে ভাল অশ্বটির সাহায্যে একাকী পলায়নের পরামর্শ দিলেন। বাবর কিন্তু এ পরামর্শে সম্মত হলেন না। সহগামী অনুচরদের বিপদের মুখে ফেলে যাবার মত নিষ্ঠুরতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল তাঁর সঙ্গীরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। বাবর আর জন কুলী মাত্র এগিয়ে চলেছেন। এদিকে বাবরের অশ্বটি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আর অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ শত্রু সৈন্য অতি নিকটে—জনকুলী বাবরের এই বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। অবিলম্বে তিনি তাঁর নিজের সুস্থ ও সবল অশ্বটির পরে বাবরকে আরোহণ করালেন। বাবরের অশ্ব আবার দ্রুত চলতে সুরু করল। বাবর মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন জনকুলীর ক্লান্ত অশ্ব ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। তাঁর একমাত্র হিতৈষী ও তাঁর সঙ্গে আর সমান তালে চলতে পারছেন না। বাবর জনকুলীকে সাহায্য করবার জন্য অশ্ব থামাবার চেষ্টা করতেই জনকুলী তাঁকে সে চেষ্টা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে লাগলেন। এদিকে শত্রুসৈন্য এগিয়ে এসেছে কাছে। জনকুলীর বারবার অনুরোধে অবশেষে বিষণ্নমনে বাবর তাঁর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন পূর্ণবেগে!

পর্ব্বত বেষ্টিত নির্জ্জন উপত্যকা। বাবরের নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ কোথায় কে জানে! পিছনের সঙ্গীরা হয়তো এতক্ষণে সকলেই নিহত হয়েছে—সঙ্গীহীন ক্লান্ত বাবরের

চোখের সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো। পথের চিহ্ন ঢেকে গেছে সে অন্ধকারে। কোথায় আছে তাঁর জন্য নিরাপদ আশ্রয় আর এক টুকরো রুটি। তূণে আছে কেবলমাত্র আর কুড়িটি তীর—আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বন। পিছনে শোনা যাচ্ছে অনুসরণকারীদের দ্রুত পদধ্বনি—ক্রমে তারা বাবরের তীরের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল। কিন্তু তারা সবাই জানত বাবরের অসাধারণ বীরত্বের কথা। সেজন্য একটু দূরে থেকেই অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে। কারণ নিশ্চিত ভাবে তারা জানত যে ক্লান্ত বাবর আর বেশীক্ষণ চলতে পারবেন না। ধরা তাঁকে দিতেই হবে।

রাত্রির অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে। বাবর তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে পর্ব্বতের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সম্মুখে আর পথ নেই। খাড়া পাহাড়ের বিশাল প্রাচীর তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে বাবরের অনুসরণকারীদের মধ্যে দুইজন অগ্রসর হয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। বিনীতভাবে বাবরকে তারা বল্ল এই দুর্গম পথে এই রাত্রির অন্ধকারে কেন তিনি অকারণ কষ্ট পাচ্ছেন। তারা এসেছে বাবরকে সাহায্য করতে। তম্বল নিজেই পাঠিয়েছেন তাদের বাবরের উদ্দেশে। কারণ তম্বলের একান্ত বাসনা যে বাবরকে তিনি ফরগণার সিংহাসনে বসাবেন।

কিন্তু বাবর তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। তম্বলের এই নিঃস্বার্থ উপকার তাঁর কাছে অত্যন্ত হীন ষড়যন্ত্র বলেই মনে হল। তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের

বল্লেন যে যদি সত্যিই তারা বাবরের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে তবে বাবর তাদের কাছে একটি মাত্র উপকার প্রার্থনা করেন সেটা হল এই দুর্গম গিরিশিখর অতিক্রম করার পথ দেখিয়ে দেওয়া। কারণ তিনি তাঁর খান আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হতে চান। এই উপকারের বিনিময়ে তিনি তাদের আশাতিরিক্ত পুরস্কার দেবেন। আর যদি তারা তাঁকে এ সাহায্য করতে প্রস্তুত থেকে না থাকে তবে তাদের ফিরে যাওয়াই ভাল কারণ বাবর তাঁর অদৃষ্টের পরে নির্ভর করে সেই দুর্গম গিরি উপত্যকাতেই থাকতে চান। বাবরের এই কথার উত্তরে তারা অনুনয় করে জানাল যে বাবর যদি তম্বলের কাছে নাই যেতে চান তবে তারাই থাকবে তাঁর কাছে তাঁর অনুচর হয়ে। বাবর যেখানেই যেতে চান তারা সাহায্য করবে তাঁকে। বাবর তখন তাঁদের পবিত্র কোরাণের নামে শপথ করে বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে বল্লেন। তারাও দৃঢ়ভাবে শপথ করল। কিন্তু তখনও বাবর তাদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কাজেই তাদের আগে চলবার আদেশ দিয়ে তিনি সতর্কতার সঙ্গে পিছনে চলতে সুরু করলেন। অতি দুর্গম অপরিসর পার্ব্বত্য পথ বেয়ে তাঁদের যাত্রা সুরু হল। পলাতক রাজা আর তাঁর দুইজন সন্দেহভাজন অনুচর। ক্রমে তারা বাবরের অজ্ঞাতসারে তাঁকে সেই অজানা পথে ভুল ভাবে পরিচালিত করতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ভিন্নপথ দিয়ে নিয়ে বাবরকে তম্বলের হাতে সমর্পণ করা। অবশেষে গভীর রাত্রে ক্ষুদ্র একটি পর্ব্বত কন্দরে তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

অনুচর দুইজন ক্ষুধার্ত্ত বাবরকে এক টুকরো রুটি দিল। বাবর সেই শুকনো রুটির টুকরোই পরম আগ্রহের সঙ্গে আহার করলেন। তারপর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি—তাঁর সমস্ত ক্লান্তি বিস্মৃত হয়ে।

পরের দিনও এইভাবেই কাটল। পার্ব্বত্য পথে সেই দুইজন বিশ্বাসঘাতকের নির্দ্দেশেই বাবর চলতে লাগলেন ভুলপথে। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাও নেমে এল। এই সময়ে তাঁরা এক তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে বাবরের সঙ্গে দেখা হল সেই পার্ব্বত্য পল্লীর মোড়লের সঙ্গে। বাবর সেই মোড়লকে চিনতেন। তিনি তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। মোড়ল তাঁকে সসম্মানে নিয়ে গেল তার গৃহে। গ্রামবাসীরা বাবরকে মেষচর্ম্মের একটি গরম পোষাক উপহার দিল। দুরন্ত শীতে বাবর অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করছিলেন। ভেড়ার লোমের এই গরম পোষাকে তিনি আরাম অনুভব করলেন। উষ্ণ পানীয় তারা এনে দিল বাবরকে। বহুদিন ক্লান্তির পরে বাবর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই গোপনে সেই মোড়ল তম্বলের কাছে দূত প্রেরণ করে বাবরের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল। বাবর একথা কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি একটি পাথরের পুরানো প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রেখে তিনি সেই গরম ঘরে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। ক্রমে ঘুম এসে ভুলিয়ে দিল তাঁকে তাঁর বিগতদিনের উদ্বেগ আর পরিশ্রম।

গভীর রাত্রে বাবরের সেই অনুচর দুইজন বাবরকে ঘুম থেকে

জাগিয়ে তুলে তাঁকে জানাল যে, গৃহটি তাদের পক্ষে নিরাপদ মনে হচ্ছে না। এর চেয়ে গ্রামপ্রান্তে যে উদ্যান আছে সেখানে আত্মগোপন করে থাকা ভাল। বাবর তাদের কথামত অন্ধকার রাত্রে গ্রাম পরিত্যাগ করে গ্রামপ্রান্তের উদ্যানে এসে উপস্থিত হলেন।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে তম্বলের কাছ থেকে এল ইউসুফ নামে একজন প্রহরী। সে বাবরের কাছে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বল্ল যে শেখ বায়াজিদ তাকে পাঠিয়েছেন বাবরের সাহায্যের জন্য। তারা সকলেই বাবরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই সে বাবরকে নিয়ে যেতে এসেছে। বাবর ইউসুফের এই কথায় অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন— "আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্কের চেয়ে সাংঘাতিক ভয় আর কিছুই নেই"। তিনি চিৎকার করে তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে সত্যই কি তারা তাঁকে হত্যা করতে চায়? যদি তাই তাদের উদ্দেশ্য হয় তবে তারা অনুগ্রহ করে তাঁকে সেকথা জানতে দিক যাতে তিনি ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা করে নিতে পারেন। তাদের পুনঃ পুনঃ আনুগত্যের শপথেও বাবরের বিশ্বাস হল না। তিনি ধীরে ধীরে সেই উদ্যানের একটি নিভৃত স্থানে গিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন শেষ সময়ের জন্য। ধীরে ধীরে তাঁর বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হয়ে এল। মৃত্যুকে প্রসন্ন চিত্তে বরণ করে নেবার জন্য তিনি

প্রস্তুত হলেন। উদ্যানের একপাশে একটি ছোট ঝরণা ছিল। তার শীতল জলে স্নান করে তিনি একান্তভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঈশ্বরের কাছে। ক্রমে গভীর ঘুমে তাঁর চোখ বুজে এলো। বাবর ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তিনি দেখতে পেলেন ধূসর অশ্বপৃষ্ঠে এসেছেন সমরখন্দের এক প্রাচীন সাধু তাঁর কাছে। বাবরের কাছে এসে তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন— ভীত হয়ো না। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ আছে তোমার 'পরে। সেই আশীর্ব্বাদই আবার তোমাকে তোমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবে। যখনই বিপদে পড়বে একাগ্রচিত্তে স্মরণ ক'র তাঁকে—সমস্ত বিপদ তুমি উত্তীর্ণ হবে অনায়াসে। ক্রমে সাধুর মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। বাবর জেগে উঠলেন। সমস্ত মন তার গভীর আনন্দে ভরে উঠেছে। মৃত্যুর ভয়ে আর তিনি তখন ভীত নন। তিনি উৎফুল্ল চিত্তে এগিয়ে এলেন যেখানে ইউসুফ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে বন্দী করার পরামর্শ করছিল। বাবর সেখানে এসে বললেন আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার আমাকে বন্দী করার সাহস ও শক্তি আছে। বাবরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবর শুনতে পেলেন উদ্যানের বাইরে বহু অশ্বখুরের সম্মিলিত ধ্বনি। মুহূর্ত্তপরেই উদ্যানের মধ্যে এসে প্রবেশ করল বাবরের অনুগত ও প্রভুভক্ত সেনানায়ক ও তার কুড়ি-পঁচিশ জন সৈন্য। তারা অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে নেমে বাবরকে অভিবাদন জানিয়ে বাবরের আদেশ জানতে চাইল। বাবর তাদের এই অকস্মাৎ উপস্থিতিতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইউসুফ ও অন্যান্য

বিশ্বাসঘাতকদের বন্দী করার হুকুম দিলেন। তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হবার পরে বাবর তাঁর সেনানায়ককে প্রশ্ন করলেন যে কি করে তারা বাবরের এই পার্ব্বত্য পল্লীতে অবস্থানের কথা জানতে পারলেন। সেনানায়ক জানালেন যে আর্শা থেকে পলায়নের পরে তিনি কোনক্রমে আন্দিজান দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি স্বপ্নে এক সাধুর কাছ থেকে বাবরের সম্বন্ধে জানতে পারেন। সেই সাধুই তাঁকে দ্রুতগামী অশ্বে বাবরের কাছে উপস্থিত হবার আদেশ দেন। তারপর তিন দিন ধরে ক্রমাগত চলবার পরে তারা ঠিক সময় মতই এসে পৌঁছেচেন।

বাবর আর কালবিলম্ব না ক'রে তাদের সঙ্গে আন্দিজান যাত্রা করলেন। এই সময়ে প্রায় দুইদিন ধরে বাবর অনাহারে কাটিয়েছেন। দ্বিপ্রহরে তাঁরা পথে একটি হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া দেখে সেটাকে হত্যা করলেন। তারপর অশ্ব থেকে নেমে ভেড়াটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আগুন জ্বেলে কোনও রকমে ঝলসে নিয়ে পরম আনন্দে আহার করতে লাগলেন। প্রচুর পরিমাণে আহার করে তাঁরা নিজেদের প্রচণ্ড ক্ষুধা নিবৃত্ত করলেন এবং আবার অশ্ব পরিচালনা করলেন আন্দিজানের পথে। পাঁচদিনের দীর্ঘপথ দুইরাত্রি ও একদিনে অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা এসে পৌঁছলেন আন্দিজানে। সেখানে তাঁর মাতুলদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাবর দীর্ঘদিনের পথশ্রম ও বিপদ থেকে মুক্ত হলেন।

বাবরের জীবনের এই কাহিনী রূপকথার বিস্ময়কেও হার মানিয়ে দেয়

কিন্তু সে যাই হোক বাবরের দুর্ভাগ্যের অবসান এতেও ঘটল না। উজবেগ নেতা শৈবানি এই সময়ে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন এবং অতর্কিতে খান ভ্রাতৃদ্বয়কে আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এই পরাজয়ের অল্প পরে সুলতান মাহ্মুদ খাঁ ও আহমদ খাঁ উভয়েই অকালে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মোগল শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেল, বাবর সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীহীন হয়ে পড়লেন। সর্ব্বত্রই তখন উজবেগ শক্তির প্রাধান্য। বাবর প্রায় একবৎসরকাল পার্ব্বত্যপ্রদেশে আত্মগোপন করে থাকার পরে অবশেষে কাবুল যাত্রা করলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সহায় সম্বলহীন বাবর এইভাবে ফরগণা উদ্ধারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আর সময় অতিবাহিত না ক'রে অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভাল মনে করলেন। ঠিক এই সময়েই কাবুলে এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। কাবুলের রাজা বাবরের আত্মীয় উলুগ বেগ এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর নাবালকপুত্র আবদর রজাককে সিংহাসনচ্যুত করে কান্দাহারের জনৈক মোগল যুবক মুকীম খাঁ কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। বাবর এই সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য অবিলম্বে কাবুল যাত্রা স্থির করে ফেললেন।

এই কাবুল যাত্রাই বাবরের ভাগ্যে পরিবর্তনের সূত্রপাত করল। ফরগণা আর সমরখন্দের সিংহাসন ঘিরে তৈমুর, উজবেগ ও মোগল বংশের যে আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল—তার ফলে বারবার যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে—অবশেষে বাবর সেই রাজ্য ও সিংহাসনের কামনা পরিত্যাগ ক'রে আফগানিস্থানের পর্ব্বত-সঙ্কুল পথে তাঁর যাত্রা সুরু করলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ—অজানা তার অধিবাসীরা—অজ্ঞাত তাদের আচার ব্যবহার আর জীবনযাত্রা প্রণালী। তবুও বিবাদলিপ্ত স্বজন পরিত্যাগ করে বাবর সেই অজ্ঞাত দেশেই যাত্রা করা সঙ্গত বলে মনে করলেন। আর এই পথই শেষে তাঁর জয়যাত্রার পথ হয়ে দাঁড়াল। ভাগ্যবিড়ম্বিত যে নবীন যুবক দুইবার সমরখন্দের

বাবর

সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছে নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন অবস্থায়—পর্ব্বত উপত্যকায়—অবশেষে আফগানিস্থানের পর্ব্বতসঙ্কুল দুর্গম পথ বেয়ে সে এসে উপস্থিত হল হিন্দুস্থানের জমিতে যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল বিশাল সাম্রাজ্য তার সোনার সিংহাসন নিয়ে। সমরখন্দ থেকে কাবুল—আবার কাবুল থেকে দিল্লী এই বিজয় আনন্দমুখরিত দীর্ঘপথ বেয়ে বারবার হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এসে দেখা দিয়েছে কত বিজয়ী—কত লুণ্ঠনকারী দস্যু—ভারতবর্ষের অদৃষ্টচক্রকে বারবার তারা পরিবর্ত্তিত করে গেছে। বাবরও সেই পথেই তাঁর যাত্রা সুরু করলেন।

স্বদেশ পরিত্যাগ করার সময়ে গভীর দুঃখ ও হতাশায় বাবরের মন ভরে উঠেছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত মনের নিভৃতে তাঁর বাসনা ছিল সমরখন্দে আবার ফিরে যাবার। স্বদেশে তাঁর জীবন আনন্দ ও আরামে অতিবাহিত হয়নি। কৈশোর ও প্রথম যৌবন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে অতিবাহিত হয়েছে—তবুও দেশের পরে তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল এবং পরবর্ত্তী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় আবেষ্টনীর মধ্যেও তিনি তাঁর সেই শৈশবের ক্রীড়াভূমিকে ভুলতে পারেন নি।

বাবর কাবুল যাত্রা করলেন মাত্র শ' দুয়েক সৈন্য নিয়ে। পায়ে তাদের শক্ত কাঠের জুতো—হাতে তাদের মস্ত মস্ত লাঠি—আর কাঁধ থেকে পা পর্য্যন্ত নেমেছে লম্বা লম্বা আলখাল্লার মত জামা। এত দরিদ্র ছিল এই যাত্রীর দল যে রাত্রে বিশ্রাম করার জন্য তাদের কাছে ছিল মাত্র দুইটি তাঁবু। সেই তাঁবু

দুটির সাহায্যেই কোনও রকমে তাঁরা রাত্রিবেলার দুরন্ত শীত নিবারণের চেষ্টা করতেন। এইভাবে ক্রমে তাঁরা ফরগণার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে এসে পৌঁছুলেন ফরগণার সীমান্তে। এর পরেই বিস্তৃত নূতন রাজ্য হিসার।..হিসারের অধিপতি তখন খসরু শাহ। বাবর যখন সমরখন্দ প্রথমবার অধিকার করেন তখন খসরু শাহ হিসারে পলায়ন করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। হিসার অতিক্রম করার সময়ে বাবরের সঙ্গে খসরু শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকী বেগ যোগ দেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও সৈন্যবল তিনি বাবরের অধীনে নিযুক্ত করেন। বাবরের অপূর্ব্ব রণকৌশল ও বীরত্বই বাকী বেগের অধীনতা স্বীকারের কারণ। ক্রমে বাবরের যাত্রাপথে একে একে খসরু শাহের সৈন্যরা এসে যোগ দিতে লাগল। বাবর জানতে পারলেন যে খসরু শাহের অধীনস্থ বিরাট মোগল-বাহিনী সামান্যতম সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করছে—প্রথম সুযোগেই তারা তাঁর দলে এসে যোগ দেবে। এইসময়ে উজবেগ নেতা শৈবানি তাঁর বিরাট সৈন্যদল নিয়ে হিসারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই উজবেগ ভীতিই হিসারের সর্ব্বত্র একটা আতঙ্ককর বিশৃঙ্খলা পরিস্ফুট করে তুলেছিল।

ক্রমে বাবরের সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়ে উঠল, তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মির্জ্জা আর নাসীর মির্জ্জা। পুরাণো দিনের সঙ্গী বা বন্ধু বিশেষ কেউ

তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। নূতনপথে নূতন যাত্রীদল সহ বাবরের এই যাত্রায় তার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন বাকী বেগ। বাবরের সৈন্যদলে প্রধানতঃ যাযাবর জাতিরাই যোগ দিয়েছিল। তাদের প্রধান্ আনন্দ আর উৎসাহ ছিল লুণ্ঠনে। সাধারণ সৈন্যদলের শৃঙ্খলা তাদের জানা ছিল না। এই অশিক্ষিত দুরন্ত পাহাড়ী আর মরুচারী যাযাবর সৈন্যদল নিয়ে অবশেষে বাবর হিন্দুকুশ পর্ব্বতের হুপিয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে সারারাত্রি চলবার পরে যেখানে এসে উপস্থিত হলেন সেখান থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন দক্ষিণ নক্ষত্রমণ্ডলের আর্গোনেভিসের পাশে সুবৃহৎ নক্ষত্রটি উজ্জ্বলভাবে আলো বিকীর্ণ করছে। এই নক্ষত্রটি 'অগস্ত্য' অথবা 'ক্যানোপাস' নামে পরিচিত। যাত্রীদল এই নক্ষত্র দর্শনকে তাঁদের ভাবী কর্ম্মপদ্ধতির পক্ষে শুভদায়ক বলে মনে ক'রে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে যখন পূর্ব্বদিকের দিকচক্রবালে তির্য্যক ভঙ্গীতে ফুটে উঠল সূর্য্যের আলোর প্রথম রেখা তখন তাঁরা পর্ব্বত উপত্যকার নীচে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে বসলো তাঁদের পরামর্শসভা। বাকী বেগ অবিলম্বে কাবুল আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। বাবরের কাছেও এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হল। অবিলম্বে সৈন্যদল সজ্জিত হয়ে উঠল। তাদের অস্ত্র ঝঞ্ঝনায় অস্থির অশ্বখুরের ধ্বনিতে সমগ্র উপত্যকা মুখরিত হয়ে উঠল। বাবর নিজে কেন্দ্রভাগের ভার গ্রহণ করলেন। কাবুল আক্রমণ সুরু হল। আক্রমণকারীরা প্রচণ্ড তেজে সহরের মধ্যে প্রবেশ করল। গৃহবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত কাবুল তাদের আক্রমণ

প্রতিরোধ করে উঠতে পারল না। সামান্য কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে কাবুল বিজয়ী বাবরের শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

এইভাবে ১৫০৪ খৃঃ অক্টোবর মাসের প্রথমে বাবর তাঁর নূতন রাজ্য কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। বাবরের তখন তেইশ বৎসর বয়স। অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাবুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাবরের কবি প্রকৃতিকে জয় করে নিল। কাবুলকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসলেন। এখানে তিনি নিজের হাতে তাঁর প্রিয় 'চার-বাগ' উদ্যান সৃষ্টি করেছিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উদ্যান রচনার দিকে এখানেই তার মন সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় এবং অবশেষে আগ্রার উদ্যানে সেই ইচ্ছা তাঁর পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

কাবুলের আবহাওয়া ও দৃশ্যাবলীতে বাবরের মন ভরে উঠল। চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, শীতল উত্তরে হাওয়া, উন্মুক্ত প্রান্তর আর বিশাল হ্রদের উদার দৃশ্য তাঁর মনকে অভিভূত করেছিল। তিনি লিখেছেন "কাবুল এমন চমৎকার দেশ যে সেখান থেকে একদিনের পথ অতিক্রম করলেই এমন জায়গায় যাওয়া যায় যেখানে কোনও দিন তুষারপাত হয়না—আবার কাবুল থেকে মাত্র দুইঘণ্টার পথ অতিক্রম করলেই চির তুষারের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। কাবুলের ফল প্রসিদ্ধ। আঙ্গুর, বেদানা, পীচ, ডালিম, আপেল আর বাদাম অপর্য্যাপ্ত-ভাবে ফলে আছে সেখানে।" বাবর নিজেও অনেক রকম ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন কাবুলে। তিনিই কাবুলে প্রথম চেরী

আর আখ আনিয়ে বপন করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে আমরা একথা জানতে পারি।

কাবুলের বাজার সে যুগে সমস্ত এশিয়ায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। প্রত্যেক বৎসর হিন্দুস্থান থেকে প্রায় বিশ সহস্র খণ্ড বস্ত্র কাবুলের বাজারে আমদানী হত। নানাপ্রকার সুগন্ধি মসলা, আখ প্রভৃতি আসত এখানে। তখন প্রায় এগারো বারো রকম ভাষার প্রচলন ছিল কাবুলে। তার মধ্যে আরবী, পারসী, তুর্কী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাই ছিল প্রধান।

প্রকৃতির পরে গভীর অনুরাগ থাকার জন্য বাবরের আত্মজীবনীতে কাবুল বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। পশু, পাখী, ফুল, প্রত্যেকটির পরেই ছিল তাঁর সপ্রশংস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কোন ঋতুতে কি ফুল ফোটে—কোন ফুলের কি বর্ণ-বৈচিত্র্য—পাখী আর পশুর বিচিত্র জীবন-যাত্রা রহস্য কি—সমস্তই ছিল তাঁর জানা। ঝোড়ো আবহাওয়ায় হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হতে না পেরে কেমন করে হাজারে হাজারে পাখী ধরা পড়ে—দড়ির ফাঁসের সাহায্যে সারস ধরা যায় কেমন ক'রে—কি করে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধরা যেতে পারে পাহাড়ী ঝরণা থেকে—এসব বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল অসীম।

তাঁর প্রিয় উদ্যান ছিল গার্ডেন অফ ফাইডালিটি। সেখানে গভীর নীল হ্রদের চারিপাশে নুয়ে পড়ত কমলালেবু আর ডালিমের ফলেভরা ডালগুলি, সবুজ ঘাসে ঢাকা চমৎকার প্রান্তর—যেন মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য। "ফাউণ্টেন অফ থ্রি ফ্রেণ্ডস্" ছিল তাঁর আর একটি প্রিয়স্থান। সুন্দর ঝরণার পাশে ছিল

তাঁর বিশ্রামের জায়গা। তিনি লিখেছেন—যখন আমি সেই ঝরণার পাশে বসে থাকতাম আর আমার চারপাশে ফুটত হলুদ আর লালে মেশানো চমৎকার সব পাহাড়ী ফুল তখন আমার মনে হত পৃথিবীতে এমন সৌন্দর্য্যময় স্থান আর নেই। সেই সুন্দর দৃশ্য তাঁর কঠোর মনকেও গলিয়ে দিত—তাঁর সমস্ত মনে জেগে উঠত এই ফুলের কোমল স্পর্শে প্রকাশহীন বেদনার আকুল ক্রন্দন।

বাবর এই সময়েই তাঁর বিশেষ এক ধরণের হস্তলিপি প্রবর্ত্তন করেন। এই বিশেষ ধরণের হস্তলিপি 'বাবর-ই-হস্তলিপি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

কাবুল দরিদ্র জনপদ ছিল। বাবরের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা কাবুলের অধিবাসীদের ছিল না। কিন্তু বাবর সেকথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি সৈন্য-বাহিনীর জন্য কাবুল অধিবাসীদের পরে এক বিশেষ কর ধার্য্য করলেন। ফলে দরিদ্র অধিবাসীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হল। বাবর বিদ্রোহ কঠোরতার সঙ্গে দমন করলেন। কিন্তু এটা তিনি স্থির বুঝতে পারলেন যে সৈন্যবাহিনী ও কাবুল অধিবাসী-দের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হলে তাঁর পক্ষে অবিলম্বে নূতন কোন দেশ জয় করা প্রয়োজন। হিন্দুস্থানের অগাধ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী তাঁর জানা ছিল। সেইসঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বে আইলাক পর্ব্বত উপত্যকার মেষপালকের ঘরে সন্ধ্যাবেলায় আগুনের ধারে বসে তিনি বৃদ্ধার কাছে তৈমুরের ভারত লুণ্ঠনের যে কাহিনী শুনতেন—হিন্দুস্থানের সোনা রূপা হীরা জহরতের যে বর্ণনা তাঁর কিশোর মনে স্বপ্ন-

জালের সৃষ্টি করত—সেই কথাই আজ তাঁর বার বার মনে পড়তে লাগল। বাবর হিন্দুস্থান অভিযানের আয়োজন করতে লাগলেন।

তাঁর প্রথম অভিযান বিশেষ সফল হয়নি। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি হিন্দুস্থানের প্রান্তসীমার যে শ্যামল রূপ দেখেছিলেন তাতে তাঁর মন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'আমি একটি নূতন পৃথিবীকে দেখতে পেলাম—এর গাছপালা, তৃণ, এর বন্যপশু, এর পাখী সমস্তই আমার কাছে অভিনব বলে মনে হয়েছে। এ দেশ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

কয়েকদিন পর্য্যন্ত সীমান্ত প্রদেশের নদীর ধারে ধারে অগ্রসর হয়ে অবশেষে সুলেমান পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রম করে তিনি অব্-ই-ইস্তাদা অথবা 'স্পন্দনহীন বারি' নামক এক হ্রদের পাশে এসে উপস্থিত হলেন। তারপরে তিনি গজনী অধিকার করলেন এবং আবার কাবুল প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। এই অব্-ই-ইস্তাদা হ্রদের সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"মনে হচ্ছিল হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি সুদূর দিক্‌সীমায় আকাশকে স্পর্শ করেছে। দূরের পাহাড়গুলির ছায়া এসে পড়েছে হ্রদের স্বচ্ছজলে। আকাশের গভীর নীল রং প্রতিফলিত হয়েছে জলের ভিতরে। দূর থেকে এক বিস্ময়কর দৃশ্য আমার মনকে আকৃষ্ট করল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম হ্রদের জলের থেকে মাঝে মাঝে আগুনের মত লালরংয়ের ঢেউ উঠে আকাশকে স্পর্শ করে দিক্‌চক্রবালে মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটি কি জানবার জন্য হ্রদের কাছে আমি অগ্রসর হলাম। হ্রদের কাছে এসে

আমার মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। দেখলাম অসংখ্য লালরংয়ের ছোট ছোট বন্য হাঁসের দল হ্রদের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে তাদেরই তরঙ্গায়িত ঢেউ বলে মনে হচ্ছিল।”

কাবুল প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বাবর ধীরে ধীরে তাঁর শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। এই সময়ে বাবর সংবাদ পেলেন যে হিসারের অধিপতি খসরু শাহ উজবেগ নেতা শৈবানির হাতে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। খসরু শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকী বেগ বাবরের সাহায্যকারীরূপে এতদিন পর্য্যন্ত বাবরকে যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন কিন্তু সম্প্রতি তাঁর ঔদ্ধত্য ও অহমিকায় বাবর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে রাজদরবার থেকে বহিষ্কৃত করেন। বাকী বেগ এর পরে আফগানদের দ্বারা নিহত হন। এরপরে কিছুদিন পর্য্যন্ত বাবর পার্ব্বত্য জাতি দমনে ব্যস্ত থাকেন। এইসব দুর্দ্ধর্ষ জাতি বাবরের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিভীষিকার সৃষ্টি করছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত এদের গেরিলা যুদ্ধে বাবর বিব্রত ছিলেন। তাদের পরে কোনও সময়েই বাবর পরিপূর্ণভাবে প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হননি। সাময়িকভাবে তাদের পরাজিত করতেন, তাদের কর দিতে বাধ্য করতেন, তারাও মেনে নিত বাবরের কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু প্রথম সুযোগেই তারা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করত। দীর্ঘদিন পরে যখন তিনি দিল্লীতে এসেছেন তখনও আফগানীরা তাঁর রাজকীয় শক্তিকে এড়িয়ে চলেছে।

কাবুল জয়ের দীর্ঘদিন পরেও উজবেগ অধিকৃত প্রিয়

সমরখন্দের কথা তাঁর স্মরণে জাগত। তিনি জানতেন যে সমরখন্দে যতদিন উজবেগ শক্তি শৈবানির অধিনায়কত্বে বর্ত্তমান থাকবে ততদিন তাঁর নিরাপত্তা সম্ভবপর নয়। শৈবানিকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় ধ্বংসোন্মুখ তৈমুর বংশের অবশিষ্ট শক্তিকে একতাবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে বাবর হিরাট যাত্রা করলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শৈবানি খাঁ এই সময়ে তৈমুর বংশের পরে শেষ আঘাত করবার জন্য উদ্যোগ করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খোরাসান আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন এবং খোরাসানের সবচেয়ে সুদৃঢ় নগর বাল্ক অবরোধ করেন। সুলতান হোসেন এই আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য এবং শৈবানিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য তাঁর বার্দ্ধক্য ও দৈহিক শক্তিহীনতা সত্ত্বেও প্রবল ভাবে বাধা দিতে সঙ্কল্প করলেন। বাবরের কাছেও তিনি আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করলেন। বাবরও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই যোগ দিলেন তাঁর প্রধানতম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজনে। শৈবানিকে পরাজিত করাই তাঁর জীবনে এখন সর্ব্বপ্রধান বাসনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শৈবানিকে পরাজিত করার অর্থ সমরখন্দ হারাবার প্রতিশোধ গ্রহণ করা, হয়তো বা সমরখন্দ পুনরুদ্ধার করার সুবর্ণ সুযোগ ও লাভ হতে পারে এই ব্যাপারে। ১৫০৬ খৃঃ জুন মাসে কাবুল থেকে তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ যাত্রা সুরু করেন। অক্টোবরের শেষ ভাগে প্রায় আটশত মাইল অতিক্রম করার পরে সুলতান হোসেনের পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ সুলতান হোসেন ইতিমধ্যে মারা যান। নদীর তীরে রাজকুমারেরা অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে। বাবরকে তাঁরা সাদরে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করলেন। বাবর এঁদের 'উদার অভ্যর্থনায় অত্যন্ত আনন্দ অনুভব

করেছিলেন। আকৈশোর কঠোর জীবনে অভ্যস্ত বাবর হিরাটে সর্ব্বপ্রথম বিলাসিতার সঙ্গে পরিচিত হন। খোরাসানের রাজধানী হিরাট তখন বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল। সবদিক দিয়েই সভ্যতার চরম উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল সেখানে। এখানকার বিদ্যায়তনে প্রাচ্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি শিক্ষা দান করতেন তখন।

হিরাট রাজবংশের বিলাসিতার এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে এসে বাবর বিস্মিত হয়েছিলেন কিন্তু আত্মহারা হয়ে যাননি। তখন পর্য্যন্ত গোঁড়া মুসলমানের রীতি অনুযায়ী তিনি সুরা স্পর্শ পর্য্যন্ত করতেন না। অবশ্য পরবর্ত্তী জীবনে যথেষ্ট সুরা পান করেছেন তিনি। সুলতান পুত্রদের এই অত্যধিক বিলাসপ্রিয়তায় তিনি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিলাসী রাজকুমারদের দ্বারা দুর্দ্দান্ত উজবেগ নেতার পরাজয় ঘটানো সম্ভবপর নয়। হিরাট অধিবাসীরা প্রত্যেকেই ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে বর্দ্ধিত—তাদের পক্ষে দুঃখময় সংগ্রামকে বরণ করে নেওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাদের যথেষ্ট নয়। যুদ্ধকৌশল তারা জানে না—সৈনিকের কষ্টসহিষ্ণুতা ও দুর্জ্জয় সাহস তাদের নেই। উজবেগদের বিরুদ্ধে যদি বাবর সংগ্রাম ঘোষণা করেন তবে খোরাসান অধিবাসীদের কাছ থেকে বিশেষ কোনও সাহায্য পাবার আশা নেই। অগত্যা বাবর কাবুলে ফিরে যেতেই মনস্থ করলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল হয়তো তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে কাবুলের পার্ব্বত্যজাতিরা রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে।

কুড়িদিন হিরাটের প্রাসাদে প্রচুর বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়ে বাবর অবশেষে আবার কাবুল প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা সুরু করলেন। তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা কাসিম বেগের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা পার্ব্বত্য পথেই যাত্রা করলেন। এই পথে কাবুলে দ্রুত পৌঁছনো যাবে এই তাঁদের আশা ছিল। তখন ডিসেম্বর মাসের তীব্র শীত। তার উপরে অবিশ্রান্ত ভাবে তুষারপাত চলেছে। স্থানে স্থানে অশ্বের রেকাব পর্য্যন্ত তুষারে আবৃত। যথেষ্ট সাহস ও সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা এই দুর্গম পথে যাত্রা সুরু করলেন। কিন্তু সেই দুরন্ত শীত আর অবিশ্রান্ত তুষারপাতে তাঁদের পথপ্রদর্শক পথ হারাল। বহু সন্ধানেও পথের খোঁজ সে পেল না। চারিদিকে সন্ধানী দল পাঠানো হল যদি বা কোনও পার্ব্বত্য অধিবাসীর সন্ধান পাওয়া যায় যাতে এই দুঃসময়ে সামান্য একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৃথাই। তিন চার দিনের মধ্যে একে একে সবকটি দলই ফিরে এল হতাশ হয়ে। কোনও জীবিত প্রাণীর সন্ধানই তারা পায়নি। সমস্ত পর্ব্বত উপত্যকায় কোথাও মানুষের বসতি নেই। তারপরে সুরু হল এই যাত্রী দলের অমানুষিক কষ্ট ভোগ। বাবর এই সময়ের কথা উল্লেখ করে বলেন—সমস্ত জীবন কষ্ট ভোগ করলেও জীবনে কখনও এত সাংঘাতিক বিপদে আমি আর পড়িনি।

"সাতদিন ধরে অবিশ্রান্তভাবে আমরা পথ চলছি। কিন্তু কেবলমাত্র দুই তিন মাইল অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সকলেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বরফ কেটে কেটে চলবার

চেষ্টা করছি। ক্রমে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের কোমর এমন কি শেষে বুক পর্য্যন্ত ডুবে যেতে লাগল। তবুও আমরা চলবার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং বরফ সরিয়ে চলবার মত পথ তৈরীর ব্যবস্থা করতে লাগলাম। যখন একজন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম তখন অপর একজন এসে তার স্থান নিচ্ছিল। কোনও কোনও সময়ে আমাদের ঘোড়াগুলিকেও এই বরফ সরাবার কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছিল। এই ভাবে অতিকষ্টে নির্ম্মিত এই চলবার পথ দিয়ে আমরা অত্যন্ত সামান্যই অগ্রসর হতে পারছিলাম। এইভাবে আরও দুই তিন দিনের পরিশ্রমের পর আমরা অবশেষে এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মধ্যে এসে পড়লাম। অতিকষ্টে এক একজন করে যখন সেই গিরিপথ অতিক্রম করা গেল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অবিশ্রাম তুষারপাতে আমরা তখন সকলেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। এই সময়ে আমাদের অগ্রগামী দল একটি গুহা আবিষ্কার করল। বাইরে তুষার ঝড় তখন অসম্ভব জোরে বইতে সুরু করেছে। অতিকস্টে গুহার কাছে এসে পৌঁছলাম কিন্তু যারা গুহার ভিতরে প্রবেশ করে ভালকরে পরীক্ষা করছিল তারা জানাল যে গুহাটি অত্যন্ত ছোট। মাত্র কয়েকজনের স্থান হতে পারে তার মধ্যে। ততক্ষণে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্লান্ত যাত্রীদল অশ্বের বলগা হাতে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গুহার মুখে। সর্ব্বাঙ্গ তাদের আবৃত হয়ে গেছে সাদা তুষার কণায়।

গুহার সম্মুখে আমি কোদালের সাহায্যে খানিকটা জায়গা খুঁড়ে নিয়ে আমার একটা বসবার মত স্থান করে নিলাম। আমার

বুক পর্য্যন্ত গভীর করে আমি গর্ত্ত খুঁড়লাম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তবুও মাটির সন্ধান পেলাম না, শুধুই বরফ। প্রবল তুষার ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি সেই গর্ত্তে আশ্রয় নিলাম। আমার সৈন্যরা বার বার আমাকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল কিন্তু আমি অসম্মত হলাম। আমার মনে হল আমার অনুরক্ত সৈন্যদলকে তুষার বৃষ্টির মধ্যে বাইরে রেখে আমার পক্ষে গুহার উষ্ণ আরামপ্রদ কক্ষে থাকা এবং তাদের অপরিসীম কষ্টের মধ্যে রেখে সুস্থভাবে নিদ্রা যাওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। তাদের দুঃখ কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়াই রাজা ও নেতা হিসাবে আমার একমাত্র করণীয় কাজ।

তাদের সঙ্গে সমস্ত বিপদ ও দুঃখকে সমানভাবে বরণ করে নিয়ে মৃত্যুও সুখের। পারস্য দেশের প্রবাদ বাক্যটি আমার মনে পড়ল—বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে মৃত্যুকে বরণ করা একটা বিরাট আনন্দ উৎসব। সুতরাং আমি বসে রইলাম সেই বরফের গর্ত্তের ভিতরে। বরফ পড়ে পড়ে ক্রমে আমার চুল নাক কান সমস্ত ঢেকে যেতে লাগল। আমার সঙ্গীদেরও সেই একই অবস্থা। ঠিক এই সময়ে গুহার ভিতরে যারা গুহাটিকে পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত ছিল তারা সংবাদ দিল যে গুহাটি বিরাট। তার ভিতরে আমাদের সমস্ত দলটিই আশ্রয় নিতে পারবে। এই সংবাদ শুনে আমি আমার বরফের গর্ত্তের বাইরে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ থেকে বরফ ঝেড়ে ফেল্লাম এবং গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম। গুহার ভিতরে প্রায় পঞ্চাশষাট জনের আশ্রয় নেবার মত প্রশস্ত স্থান

ছিল। সেইখানে সকলে আশ্রয় নিল। তারপর যার কাছে যা খাদ্য ছিল সে সমস্ত বের করে পরম আনন্দে পরস্পরের মধ্যে ভাগ করা হল। এই ভাবে বাইরের দুরন্ত তুষার ঝড় থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে পরম আরামে উষ্ণ নিরাপদ আশ্রয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলাম।"

এই ভাবে বন্ধুত্ব ও নিঃস্বার্থ প্রীতির সাহায্যে জীবনকে বিপদ-গ্রস্ত করেও—বাবর সৈন্যদের কাছে নিজেকে প্রিয় করে তুলেছিলেন। তারা জানত যে বাবর তাদের প্রত্যেকের বিষয়েই আগ্রহ সম্পন্ন—তারা প্রত্যেকেই তাঁর প্রীতির পাত্র। তারা জানত যে তাদের বিপদে বাবরের সহানুভূতি ও সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত হবে না তাই বাবরের জন্য তারা নিজেদের জীবন অতি অনায়াসেই বিপন্ন করতে একটুও দ্বিধা বোধ করত না। অধিনায়ক হবার উপযুক্ত বহু গুণ ছিল বাবরের। নমনীয়তা এবং কঠোরতা পাশাপাশি দেখা যেত তাঁর চরিত্রে। তাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। সর্ব্বোপরি যে কাজ তিনি নিজে সম্পন্ন করতে পারতেন না সে কাজের ভার কখনও তাঁর সৈন্যদের পরে তিনি দিতেন না। সৈন্যদের সঙ্গে এই বন্ধুপূর্ণ সস্নেহ ব্যবহারই ছিল ছিল তাঁর সৌভাগ্যের অন্যতম মূল সূত্র। এরই সাহায্যে চরম দুঃখের দিনেও বিজয় লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে বারে বারে।

সৌভাগ্যবশতঃ এই দুঃখের যাত্রা শেষ হয়ে এসেছিল। পরদিন প্রভাতে তুষার আর ঝড় দুইই থেমে গেল। তাঁরা গুহার বাইরে এসে দেখলেন শীতল হাওয়া সত্ত্বেও আকাশ পরিষ্কার

হয়ে গেছে। চারিদিকে উষ্ণ সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে তুষারের শীতল কঠিন গায়ে। উৎসাহিত চিত্তে সারাদিন ধরে তাঁরা আবার চল্‌তে লাগলেন সেই বরফের রাশি ভেঙ্গে। সমস্তদিন চলার পর রাত্রির দিকে শীত অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিল। শীতের প্রখরতায় তাঁদের কারো কারো হাত পা হয়ে গেল অবশ। পরদিন প্রভাতে তাঁরা এক পর্ব্বত উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। সেই পর্ব্বত উপত্যকার শেষপ্রান্তে এসে অবশেষে তাঁরা নীচে লোকবসতিপূর্ণ গ্রাম দেখতে পেলেন। পর্ব্বতের নীচের অধিবাসীরা সেই তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখর হতে নেমে আসা যাত্রীদলের দিকে অবাক চেয়ে রইল। তাদের ধারণাই ছিল না যে সেই দুর্গম পথ বেয়ে এই দুরন্ত শীতের দিনে কোনও মানুষ এসে লোকালয়ে পৌঁছতে পারে। ক্রমে সেই সব গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে—বাবর বুঝতে পারলেন যে—যে তুষারপাতকে তাঁরা এত বিপদজনক বলে মনে করেছিলেন সেই তুষারপাতই তাঁদের জীবনকে বাঁচিয়েছে। বরফ পড়ার আগে ঐ পর্ব্বত শিখরের মাঝে মাঝে ছিল গভীর খাদ—সাধারণ অবস্থায় তাদের অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। কিন্তু অবিশ্রান্ত তুষারপাতের ফলে সেই সব খাদ পরিপূর্ণ হয়ে শিখর থেকে শিখরান্তরে যাতায়াতের পথ তৈরী করে দিয়েছিল। এ ছাড়া কোনক্রমেই তাঁদের লোকালয়ে পৌঁছবার উপায় ছিল না। সে রাত্রি তাঁরা যাপন করলেন গ্রামবাসীদের মধ্যে—তাদের জ্বালানো আগুনের পাশে বসে, তাদের আনীত রুটী আর চর্ব্বিযুক্ত ভেড়ার মাংস পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে আর তাদের সঙ্গে

সহজ ভাবে গল্প করে। অবশেষে কোমল উষ্ণ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁরা। গতদিনের দুঃখ ও কষ্টকে দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল তাঁদের।

কাবুলের কাছাকাছি এসে বাবর শুনতে পেলেন কাবুলে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। বাবরের অনুপস্থিতিতে গুজব উঠেছিল যে তিনি খোরাসানে বন্দী হয়েছেন। এই গুজবের পরে নির্ভর করে কাবুলের অবশিষ্ট মোগল অধিবাসীরা এক নূতন রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন করে। সমরখন্দের মৃত সম্রাট সুলতান মামুদের কনিষ্ঠ পুত্র খান মির্জ্জা এই নূতন রাজা। সুলতান মাহমুদ বাবরের পিতৃব্য ছিলেন, এবং খান মির্জ্জার মাতা ছিলেন —বাবরের মাতার সৎভগিনী। সুতরাং দুই দিক দিয়েই খান মির্জ্জা ছিলেন—বাবরের নিকট সম্পর্কিত।

বাবর অতি অল্প আয়াসেই বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হন এবং উদার ভাবে খান মির্জ্জার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। তিনি তাদের সকলকেই মুক্তিদান করেন। আত্মীয় স্বজনের পরে বাবরের চিরদিনই গভীর ভালবাসা ও স্নেহ ছিল। শত অপরাধেও তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিতে পারতেন না। তাদের দুঃখে তিনি নিজেই অত্যন্ত দুঃখ বোধ করতেন।

এই ভাবে বাবরের খোরাসান অভিযান সমাপ্ত হল। কাবুলে অবস্থানকালে তিনি সংবাদ পান যে হিরাট তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা নিয়ে উজবেগ নেতা শৈবানির পদানত হয়েছে। তৈমুরের বংশধর হিসাবে কেবলমাত্র বাবরই অবশিষ্ট ছিলেন—এবং শৈবানির পরবর্ত্তী লক্ষ্য বাবর আর তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য ও সিংহাসন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাবুলে উপস্থিত হবার অল্প পরেই বাবর শৈবানির হাতে হিরাটের আত্মসমর্পণের সংবাদ জানতে পারেন। তৈমুরের একমাত্র বংশধর বাবরকে ঘিরে তখন পরাজিত রাজবংশের সকলে দাঁড়ালেন যাতে অন্ততঃ বাবর শৈবানির এই অপরাজেয় শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেন। এমন কি বাবরের এক সময়ে বিরোধী পক্ষও আজ নির্ব্বিচারে বাবরের প্রভুত্বকে মেনে নিল। কান্দাহারের অধিপতি চেঙ্গীস খাঁর বংশধর মুকীম শাহ্ উজবেগদের হাত থেকে কান্দাহারকে রক্ষা করার জন্য এই সময়ে ব্যগ্রভাবে বাবরকে আহ্বান জানালেন। বাবরও সাগ্রহে অবিলম্বে এই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং সসৈন্যে কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শৈবানির উদ্যত হস্ত থেকে কান্দাহারকে রক্ষা করার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে উঠলেন।

কিন্তু কান্দাহারের উপকণ্ঠে এসে বাবর তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এখান থেকে তিনি কান্দাহার রাজের কাছে দূত মুখে এই দাবী জানালেন যে তাঁকে তৈমুর বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করে নিতে হবে। শাহ্ বেগ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বিশেষ ইতিমধ্যে তিনি শৈবানির সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছিলেন। তিনি বাবরের সঙ্গে অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহার করলেন। বাবর কাপুরুষ ছিলেন না—তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মসম্ভ্রমী মন এই অপমান নিঃশব্দে সহ্য করার হীনতাকে মেনে

নিতে রাজী হল না। কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি তাঁর সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন—এবং শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য দৃঢ় চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বাবর লিখছেন—এই সময়ে আমার সৈন্য সংখ্যা মাত্র এক সহস্র ছিল। যদিও শত্রুর বিপুল সৈন্যের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত সামান্য তবুও আমি যে অল্প সৈন্য নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হবার সাহস করেছিলাম—তার কারণ ছিল আমার সৈন্যদের শিক্ষা। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও দিনই আমার সৈন্যরা এমন চমৎকার ভাবে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। আমি নিজে আমার সৈন্যদের যথেষ্ট পরিশ্রম ও ক্লেশস্বীকার করে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলাম।

যুদ্ধের সময়ে বাবরের এই ক্ষুদ্র অথচ সুশিক্ষিত সৈন্যদলের কাছে কান্দাহার সৈন্যরা বার বার পরাজিত হল। প্রবল যুদ্ধের পরে কান্দাহারের সৈন্যরা পলায়ন করতে বাধ্য হল। দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। বিজয়ী বাবর দুর্গে প্রবেশ করলেন মহা-উল্লাসে। দুর্গ অধিকারের পুরস্কার রূপে বাবর পেলেন অজস্র ধনরত্ন ও অন্যান্য মূল্যবান সব সম্পত্তি। অবশেষে বহুতর গাধার পিঠে প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণ-রৌপ্য চাপিয়ে বিজয়ীদল সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করল কাবুলে।

কাবুল প্রত্যাবর্ত্তনের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবর জানতে পেলেন তাঁর ভ্রাতা নাসীরকে তিনি যে কান্দাহার দুর্গের ভার দিয়ে এসেছিলেন সেখানে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং শৈবানি তাঁর বিপুল শক্তি নিয়ে অবরোধ করেছেন

কান্দাহার। এর পরে কোনও প্রকারে নাসীর কান্দাহার দুর্গ থেকে পালিয়ে গজনীতে চলে আসতে সক্ষম হন। কান্দাহার আবার তার পুরাতন রাজা মুকীমশাহের অধিকারে চলে যায়। এই সময়ে এক জনরব ওঠে যে শৈবানি কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেছেন তৈমুরের শেষ বংশধরকে পরাজিত ও বন্দী করার জন্য। তাঁর বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে কাবুলকে রক্ষা করা অসম্ভব বলেই মনে হল বাবরের। জীবনে এই একটিমাত্র লোকের দুর্জ্জয় শক্তিকে বাবর ভয় করতেন। বহুবার বহু রণক্ষেত্রে শৈবানির শক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। বাবর কাবুলের সিংহাসনে তাঁর এক আত্মীয়কে স্থাপন করে নিজে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যবশতঃ শৈবানি সেবার কাবুল পর্য্যন্ত অগ্রসর হননি। কাজেই বাবর আবার কাবুলে ফিরে এলেন। কিন্তু কাবুলের মোগল সৈন্যদের মধ্যে তখন বাবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব দেখা দিয়েছে। মোগল সৈন্যরা লুণ্ঠনপ্রিয় জাতি ছিল। অত্যাচার, হত্যা আর লুণ্ঠন এই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু বাবরের কঠোর শাসন ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে তাদের পক্ষে এসব কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য তাদের অসন্তোষের সীমা ছিলনা। বিদ্রোহ ধীরে ধীরে মোগল সৈন্যদের মধ্যে ধূমায়িত হতে লাগল।

এই সময়ে বাবর এক নূতন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে বাদশা অর্থাৎ সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্ত্তী জীবনে বরাবরই তিনি এই উপাধি ব্যবহার করে গেছেন।

তৈমুরের বংশে এপর্য্যন্ত এই উপাধি আর কেহ গ্রহণ করেন নি।

এর অল্প কিছু পরেই বাবর মোগল সৈন্যদের গোপন বিদ্রোহের সংবাদ পান। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর নিজের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল কাজেই এই গোপন বিদ্রোহ সংবাদকে তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তারই ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় দুর্গের সিংহ দরজার সম্মুখে তিনি মোগল বিদ্রোহীদের দ্বারা সহসা আক্রান্ত হয়ে বন্দী হবার উপক্রম হন। কোনও ক্রমে রক্ষা পাবার পর মাত্র পাঁচশত সৈন্য নিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে কাবুল পুনরুদ্ধার করেন। বিদ্রোহীদের মনোনীত কাবুলের নূতন রাজা আবদর রজাককে বাববের হাতে সমর্পণ করা হল। বাবর তাঁকে উদারভাবে মুক্তিদান করলেন। বাবরের চরিত্রের সব চেয়ে বড় সম্পদ ছিল এইখানেই। পরম শত্রুর সঙ্গেও তিনি বিশ্বস্ততা ও উদারতার সঙ্গে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। তাঁর উদার হৃদয়ের অবারিত দাক্ষিণ্যে সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দিতেন। তাঁর সমস্ত জীবনে এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। তাঁর ভ্রাতা জাহাঙ্গীর কতবার শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করেছিলেন কিন্তু হিরাটে বাবর তাঁকে ক্ষমা করে স্নেহ ও ভালবাসায় তাঁকে অভিভূত করে দেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসীর বাবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ও ভগ্ন মনোরথ হয়ে যখন তিনি বিষণ্ণচিত্তে ফিরে এলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার কাছে—তখন স্নেহশীল বাবর তাঁকে বিন্দুমাত্রও তিরস্কার না করে তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন। তাঁর মনের দুঃখ ও হতাশাকে দূর করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি তাঁকে কান্দাহারের শাসন ভার অর্পণ করেছিলেন এবং যখন কান্দাহার শত্রু হস্তে পতিত হয় তখন গজনীর শাসন ভার তাঁকে দেন। বাবর কারো বিরুদ্ধেই গোপন হিংসা ও বিদ্বেষ কখনও পোষণ করতে পারতেন না। সেইজন্যই তিনি আবদর রজাককে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন।

কাবুলের প্রথম বিদ্রোহের সময়ে অন্যতম প্রধান বিদ্রোহী ছিল—দুগলৎ মির্জ্জা। বাবর তাঁকে মার্জ্জনা করে মুক্তি দেবার পরে সেই বিশ্বাসঘাতক শৈবানির দলে যোগদান করে। পরে শৈবানির অত্যাচারে দুগলৎ মির্জ্জার মৃত্যু ঘটলে তার শিশু পুত্র মির্জ্জা হায়দর বাবরের কাছে আশ্রয় প্রার্থী হয়। বাবর তখন তার পিতার শত্রুতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে সাদরে ও সসম্মানে হায়দরকে আশ্রয় দেন। এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হায়দর মির্জ্জা জীবনে কখনও সেই উদার আতিথেয়তাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাঁর কাহিনীতে সেই উদার অভ্যর্থনার এক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে গেছেন। তিনি লিখছেন—

"কাবুলে উপস্থিত হয়ে আমি সম্মান ও সহৃদয়তার সঙ্গে গৃহীত হলাম। যখন সম্রাটের কাছে আমি উপস্থিত হলাম তখন দেখতে পেলাম তাঁর সুন্দর উজ্জ্বল চোখ দুটি থেকে অজস্রধারে স্নেহ ও মমতা ঝরে পড়ছে। সে দৃষ্টির প্রসন্নতায় আমার সমস্ত মন ভরে উঠল। আমি নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতেই তিনি

দুহাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর বুকের ভিতরে টেনে নিলেন। তার-পর আমাকে তাঁর আসনের পাশে বসিয়ে সস্নেহে আমাকে বলতে লাগলেন—'ভাই, তুমি তোমার পিতা ও আত্মীয়স্বজন সকলকে হারিয়েছ.। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি নিরাপদে এসে পেঁাছেচ আমার কাছে। এই বিপদে তুমি হতাশ হয়ে পড়োনা—আমি তোমাকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করে তোমার পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়ে দেব। আমার স্নেহ দিয়ে আমি তোমার পিতৃস্নেহের অভাব দূর করব।' এইভাবে তিনি আমার মত অনাথ দরিদ্র বালককে ভালবাসা ও স্নেহে মুগ্ধ করে দিলেন।

দীর্ঘ দিন আমি অতিবাহিত করলাম তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে। কখনও সস্নেহ ব্যবহারে আবার কখনও বা মৃদু তিরস্কারে তিনি আমাকে পাঠে উৎসাহিত করেছেন—পুত্র ও উত্তরাধি-কারীর সুশিক্ষার দিকে পিতা যেমন সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তেমনই ব্যগ্র দৃষ্টি ছিল তাঁর আমার পরে। সম্রাটের স্নেহ ও মমতায় আমি আমার সমস্ত দুঃখকে ভুলতে পেরেছিলাম। ১৫১২ খৃঃ পর্য্যন্ত আমি সম্রাটের কাছে ছিলাম। রণে, বনে, শিকারে সর্ব্বত্রই সম্রাটকে অনুসরণ করবার সৌভাগ্য আমি অর্জ্জন করেছিলাম।"

এই কৃতজ্ঞচিত্ত বালকের কাহিনীর প্রতিছত্রে ফুটে উঠেছে বাবরের চারিত্রিক সৌন্দর্য্য-তাঁর স্নেহপ্রবণ ক্ষমাশীল মনের পরিচয়।

এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। কাবুলে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বাবরের রাজ্যশাসন কার্য্য চলতে লাগল। এই সময়টা বাবর তাঁর রাজ্য ও রাজধানীকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তুলতে অতিবাহিত করেছিলেন। শিকারের আনন্দও ছিল তাঁর অত্যন্ত বেশী। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য আফ-গানদের সঙ্গে চলছিল তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই সময়ে আবার কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বাবরের আহ্বান এল। ১৫১০ খৃঃ শীতকালে সংবাদ এল বাবরের কাছে যে পারস্যের নূতন সম্রাট শাহ্ ইস্‌মাইল উজবেগ নায়ক শৈবানিকে পরাজিত করেছেন। বিপর্য্যস্ত উজবেগ সৈন্যদল বিপন্নভাবে চারিদিকে পলায়ন করছে। খোরাসান উজবেগ শক্তির অত্যাচার থেকে মুক্ত। বাবর সেই মুহূর্ত্তেই সমরখন্দে উপস্থিত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। পথঘাট তখন তুষারে আবৃত হয়ে গেছে। কিন্তু বাবর সে বিপদ গ্রাহ্য করলেন না। তৈমুরের সিংহাসনে বসে বিপুল সাম্রাজ্য শাসন করবার যে স্বপ্ন তাঁর সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই স্বপ্ন হয়তো বা সফলতা লাভ করবে এই সুযোগে। উজবেগ শক্তি পরাজিত—তার হাত থেকে সমরখন্দ কেড়ে নেওয়া বাবরের পক্ষে অসম্ভব হবেনা। সামান্য বরফ ও তুষারের বাধা কি তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে। হারানো স্বর্গকে আবার ফিরে পাবার কামনা তাঁর মনে দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠল। অবিলম্বে পারসীক সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে শৈবানিকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করার জন্য তিনি যাত্রা করলেন। পারস্যে পৌঁছে বাবর শুনতে পেলেন যে শাহ ইসমাইল ইতিমধ্যেই যুদ্ধে উজবেগ শক্তিকে পরাজিত করেছেন এবং শৈবানি তাঁর হাতে নিহত হয়েছেন। শাহ ইসমাইল তাঁর পরম শত্রু শৈবানির মাথার খুলিতে সোনার কাজ করিয়ে তাকে পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন।

কিন্তু এই বিপর্য্যয় সত্ত্বেও উজবেগ সৈন্যদের শক্তি বা সাহস কিছুই কমল না। বাবরকে পরাজিত করবার জন্য তারা পূর্ণ উদ্যমে আয়োজন করতে লাগল। উজবেগদের পুরাতন ও অভিজ্ঞ সেনাপতিরাই সৈন্যদলকে পরিচালিত করছিলেন। বাবর কয়েকবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অবশেষে পারস্য সম্রাটের প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক উজবেগ বাহিনী বাবরকে আক্রমণ করায় বাবর তাঁর অল্প সৈন্য নিয়ে এক গিরিপথের মধ্যে আশ্রয় নেন। প্রবল সংগ্রামের পরে অবশেষে বাবরের অসাধারণ বীরত্বের ফলে উজবেগরা ক্রমে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হল। এইভাবে কারসী, বোখারা এবং অবশেষে সমরখন্দ থেকেও তারা পালিয়ে গেল। তুর্কীস্থানের মরুভূমিই হল তাদের আশ্রয়স্থল। পারস্য সম্রাটের অনুমতি নিয়ে বাবর তাঁর প্রিয় সমরখন্দে ফিরে গেলেন আবার। সমরখন্দের সিংহাসন অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য।

সমরখন্দে বাবরের প্রত্যাবর্ত্তনে বিপুল আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ছোট বড়, ধনী নির্ধন, পদস্থ সেনানায়ক থেকে ক্ষুদ্রতম সেনানী সকলেই এই আনন্দোৎসবে যোগ দিল। নানা ফুল লতাপাতায় রাজধানী সুশোভিত হয়ে উঠল। রাস্তা পথ ঘাট সব স্বর্ণ বস্ত্রে আবৃত করে দেওয়া হল। নানারকম চিত্রসম্ভার সাজানো হল চতুর্দ্দিকে। বিপুল জয়োল্লাস ও আনন্দের সাড়ার মধ্যে সম্রাট সমরখন্দে প্রবেশ করলেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বাবর—তুর্কীস্থানের মরুপ্রান্তর থেকে সুরু

করে ভারতবর্ষের প্রান্তদেশ কাবুল ও গজনী পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য সীমা—সমরখন্দ, বোখারা, হিসার এবং ফরগণার পরে তাঁর প্রভুত্ব বিস্তৃত। ভারতবর্ষ বিজয়ের স্বপ্নকে মন থেকে বিদূরিত করে দিলেন তিনি। ক্ষুদ্র আফগান রাজ্য তিনি তাঁর ভ্রাতা নাসীরকে দান করলেন। সমরখন্দে তৈমুরের সিংহাসনে বসে বিশাল রাজ্যের পরে আধিপত্য করাই ছিল বাবরের জীবনের একমাত্র কামনা।

কিন্তু বাবরের এই বিজয় হল ক্ষণস্থায়ী। অদৃষ্ট দেবতার নির্দ্দেশে বাবরের জন্য সঞ্চিত ছিল বৃহত্তর কর্ম্ম-জগতের দুর্লভ সৌভাগ্য। তৈমুরের সিংহাসন তাঁর প্রতিভার যোগ্য স্থান ছিলনা। তাই সমরখন্দ থেকে আবার তাঁকে বিদায় নিতে হ'ল। পারস্য সম্রাট শাহ ইসমাইলের অনুগ্রহ ও সাহায্যেই তিনি সমরখন্দের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। সেজন্য শাহ ইসমাইলের পরে তাঁর গভীর অনুরক্তি ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাবর প্রকৃতপক্ষে শাহ ইসমাইলের প্রভাবাধীন ছিলেন, এবং এই প্রভাবের জন্য তিনি পারসীকদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। ধর্ম্মের দিক দিয়েও পারসীকদের ধর্ম্মই তিনি পালন করতেন। শাহ ইসমাইলের পরে এই অনুরক্তিই বাবরের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল পারস্য সম্রাটের ধর্ম্ম সিয়া অথচ সমরখন্দ ও বোখারার অধিবাসীরা ছিল গোড়া সুন্নি। তাদের মনোবৃত্তি শাহ ইসমাইলের মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বিধর্ম্মীর কাছে বাবরের এই আনুগত্য স্বীকারে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠল। ক্রমবর্দ্ধমান এই অসন্তোষ বাবর অনুভব করতে পারছিলেন। ক্রমে অসন্তুষ্ট প্রজাবৃন্দ বিধর্ম্মী বাবরের পরিবর্ত্তে দুরন্ত উজবেগ প্রাধান্যকেও মেনে নেওয়া সঙ্গত বলে মনে করতে লাগল। এরই ফলে উজবেগ সৈন্যদের হাতে বাবরের বিপুল বাহিনীর পরাজয় ঘটল। অন্তর্বিপ্লব ক্রমেই ভয়াবহরূপ ধারণ করতে লাগল। অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে বাবর চলে গেলেন সমরখন্দ পরিত্যাগ করে চিরদিনের মত। সমরখন্দের আনন্দ, তৈমুরের সিংহাসনের স্বপ্ন, সমস্ত রইল পিছনে। অদৃষ্ট আবার তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল নূতন পথে—নব সৌভাগ্যের অন্বেষণে।

ভগ্নহৃদয়ে বাবর পালিয়ে গেলেন হিসারে। এখানে একদিন রাত্রে অতর্কিতে বিশ্বাসঘাতক মোগল সৈন্যরা বাবরকে আক্রমণ করল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে বাবর কোনক্রমে অন্ধকারে নগরের বাইরে পলায়ন করলেন। উন্মত্ত মোগলসৈন্য সমগ্র হিসার প্রদেশে শ্মশানের বিভীষিকা জাগিয়ে তুলল। হিসারের শস্য, তার সম্পদ, তার গৃহপালিত পশু সমস্ত জিনিষকে তারা ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। এই ধ্বংসলীলার ফলে এল মহামারী আর দুর্ভিক্ষ। সেইসঙ্গে দেখা দিল দুরন্ত শীত। অবিশ্রান্ত তুষারপাত সুরু হল হিসারে। সে তুষার-পাতে সমতলভূমি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে গেল। অবশেষে এল উজবেগ দস্যুদল হিসারের ধ্বংসকার্য্য সমাপ্ত করার জন্য। তারা আক্রমণ করল মোগলদের। প্রাণরক্ষার আতঙ্কে মোগল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তুষার নদীতে তাদের কেউ কেউ

ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের। অবশিষ্টরা প্রাণ দিল উজবেগের তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে।

কুন্দুজের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বাবর হিসারের এই সর্ব্বনাশা পরিণতি লক্ষ্য করেছিলেন। সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ শিখর থেকে বাবর আবার নেমে এলেন দুর্ভাগ্য ও নিঃস্বতার মাঝে। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য মিশে গেছে ধূলায়। উজবেগ অধিকৃত হিসার উদ্ধারের আশা তিনি ত্যাগ করেছেন, সুসময়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের যেসকল প্রদেশ তিনি দান করেছিলেন, প্রার্থনা করলে হয়তো তাদের কাছে সাহায্য ও সহানুভূতি পেতেন। কিন্তু উদার হৃদয় বাবর সে কাজে নিজেকে হীন করতে চাইলেন না। তাঁর এই নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয়কে তিনি শান্ত ও সংযতভাবেই গ্রহণ করলেন। জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কাবুলে ফিরে গেলেন তিনি। তৈমুরের সিংহাসন তিনি অধিকার করেছিলেন আপন ক্ষমতায়, সে সিংহাসন তিনি হারিয়েছিলেনও বহুবার, সেই দুর্দ্দিনেও বিশ্বাসী সৈন্যদল ছিল তাঁর সঙ্গে কিন্তু আজ নিঃস্ব বাবর প্রজাদের অনুরক্তি হারিয়েছেন—শত্রুর হাতে ঘটেছে তাঁর নিদারুণ পরাজয়—ঘৃণিত মোগল দস্যু কর্ত্তৃক তাঁর প্রিয় পিতৃভূমি হয়েছে অত্যাচারিত। নিরুপায় হয়ে পিতৃভূমি উদ্ধারের আশা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে বাবর অবশেষে পূর্ব্বদিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন—"১৫০৪ খৃঃ যখন আমি প্রথম কাবুল বিজয় করি তখন থেকেই হিন্দুস্থান বিজয়ের জন্য আমার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল।" বহুবার বাবর ভারতবিজয়ের কল্পনা করেছেন মনে মনে কিন্তু প্রতিবারই বাধা এসেছে চারিদিক থেকে। অবশেষে ১৫১৯ খৃঃ সকল বাধা ও বিপদকে অতিক্রম করে বাবর এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য। প্রথমেই বাবর সীমান্তের বজৌর দুর্গ আক্রমণের উদ্যোগ করলেন। বাবরের পক্ষের সৈন্যরা এই যুদ্ধে কামান ব্যবহার করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বজৌর দুর্গ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বজৌরীরা ইতিপূর্ব্বে কামান বা বন্দুকের ব্যবহার দেখেনি। সুতরাং দলে দলে তারা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাল। মাত্র তীরধনুক ও তরবারীর সাহায্যে তারা এই অভূতপূর্ব্ব আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারল না। বজৌর অধিকার করে বাবর বিজয় উৎসব করলেন বিপুল উল্লাসে। হতভাগ্য বজৌর অধিবাসীরা যারা তখনও জীবিত ছিল বিজয়ী মুসলমান সৈন্যদলের হাতে নানা অত্যাচার ও নির্য্যাতনের পরে নিহত হল। নিহতের সংখ্যা প্রায় তিনসহস্রেরও বেশী ছিল। বাবরের চরিত্রের উদারতা-সত্ত্বেও মাঝে মাঝে যে তাঁর মধ্যে নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যেত একথা অস্বীকার করা চলেনা। হয়তো বা তাঁর মাতামহ

মোগল বংশের নৃশংসতাকে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তারই প্রকাশ দেখা যেত কখন কখন তাঁর চরিত্রে।

বজৌর অধিকারের পর তিনি আরও পূবদিকে অগ্রসর হলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করলেন তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত হস্তী অশ্ব প্রভৃতি নিয়ে। সৈন্যসংখ্যা এই সময়ে তাঁর সঙ্গে পনের শত থেকে দুই হাজারের মধ্যে ছিল। রসদ সংগ্রহের আশায় তিনি দ্রুত পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত 'বীর' প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন। 'বীর' প্রদেশ অধিকারে তাঁর বিশেষ কষ্ট করতে হলনা। আত্মসমর্পণকারী বীরের অধিবাসীদের পরে একটা যুদ্ধকর প্রবর্ত্তন করে তিনি তাঁর সৈন্যদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার লুণ্ঠন ও অত্যাচার তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। বীরের আশেপাশের ছোট ছোট দেশগুলিও বাবরের আধিপত্য স্বীকার করে নিল। ভারতবর্ষ বিজয় স্থগিত রেখে বাবর এর পরে কাবুল যাত্রা করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে দিল্লীর সিংহাসনে লোদীবংশের স্থলতান ইব্রাহিম লোদী অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাবর তাঁর কাছে রাজদূত প্রেরণ করে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করার দাবী জানালেন। বাবরের এই দাবীর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে পাঞ্জাব তৈমুর বংশের অধীন ছিল বহুদিন পর্য্যন্ত। সুতরাং তৈমুরের বংশধর হিসাবে তাঁর অধিকার আছে পাঞ্জাবের পরে। লাহোরের শাসনকর্ত্তা দোলত খাঁ লোদীর কাছেও তিনি দূত প্রেরণ করেন তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে

যাতায়াতের অনুমতি দাবী করে। কিন্তু দৌলত খাঁ দীর্ঘ পাঁচমাস পর্য্যন্ত সেই রাজদূতকে অনর্থক অপেক্ষা করিয়ে তাকে ফিরে যেতে বলেন এবং দিল্লী যাবার অনুমতি তাঁকে দেন না। রাজদূত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাবুলে বাবরের কাছে ফিরে যান।

এই সময়ে কাবুলে বাবর কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁর নিজের রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। পার্ব্বত্য জাতিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দমনে তাঁর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এরই মাঝে মাঝে তিনি কয়েকবার অভিযান চালনা করেন পাঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই বাবরের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে। সুলতান ইব্রাহিমের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধের সূচনা দেখা দেয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বিদ্রোহী আফগানদের হত্যা করেন। তাঁর এই কাজের ফলে আফগানদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। বহু প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ দিল্লীর প্রভুত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।

এই সময়ে আলম খাঁ নামে দিল্লীর এক রাজকুমার কাবুলে উপস্থিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসন লাভের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য বাবরকে অনুরোধ জানান। এই সময়েই আবার লাহোরের শাসনকর্ত্তা বাবরের কাছে দিল্লীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে পাঠান। এইভাবে বাবরের পক্ষে এক সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হল। গৃহবিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহে ভারতবর্ষের ঐক্য তখন

বিপন্ন—তার অপরিমেয় দুর্ব্বার শক্তি বিনষ্ট। এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর কী হতে পারে অভিযানকারীর পক্ষে? বাবর আর কালবিলম্ব না করে সসৈন্যে যাত্রা করলেন এবং অতি শীঘ্র লাহোরের কাছে এসে পৌঁছলেন। বাবর লাহোরে এসে উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই দিল্লীর সৈন্যদল কর্ত্তৃক দৌলত খাঁ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছিলেন। বাবর আর বিলম্ব না করে ঝড়ের গতিতে দিল্লীর সৈন্যদলকে আক্রমণ করে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে ফেল্লেন। লাহোর রাজপথে হত্যা ও লুণ্ঠনের এক বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। চারদিন লাহোরে থেকে বাবর তাঁর বাহিনী সহ দিবলপুরে এসে উপস্থিত হন। এখানে দৌলতখাঁ এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। দৌলত খাঁর আশা ছিল বাবরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি লাহোরের শাসনভার ফিরে পাবেন কিন্তু এখানে কয়েকদিন বাবরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করার পরেই তাঁর সে ভুল ধারণা গেল। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে বাবর তাঁর পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরের মত কেবলমাত্র ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেই কাবুলে ফিরে যাবেন না। বাবরের উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করা। দৌলত খাঁর বিশেষ কোনই লাভ নেই বাবরের জয়লাভে। দৌলত খাঁর মন অসন্তোষে ভরে উঠল। তিনি গোপনে পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে আত্মগোপন করলেন।

ইতিমধ্যে বাবর তাঁর বিজিত পাঞ্জাব প্রদেশের শাসনভার আলম খাঁর পরে অর্পণ করে কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

বাবরের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দৌলত খাঁ আত্মপ্রকাশ

করলেন এবং আলম খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আবার নিজে পাঞ্জাব অধিকার করলেন। আলম খাঁ কাবুলে বাবরের নিকটে উপস্থিত হলেন। ১৫২৫ খৃঃ বিপুল সৈন্যসংখ্যাসহ শেষ বারের জন্য বাবর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূনও তাঁর পিতার সঙ্গে এই অভিযানে যোগদান করেন। ঝিলাম অতিক্রম করে এসে অবশেষে লাহোরের নিকটে উপস্থিত হলেন তিনি। এইখানে দৌলত খাঁ প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ বাবরের গতিরোধ করার চেষ্টা করেন বটে কিন্তু বাবরের প্রচণ্ড আক্রমণে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দৌলত খাঁ লোদী বন্দী হলেন। বাবর তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট সম্মানের সহিত ব্যবহার করেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামাঞ্চলের শাসনভার তাঁকে অর্পণ করেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দৌলত খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইভাবে সমগ্র পাঞ্জাবকে শত্রুকবলমুক্ত করে এবং সেখানে শাসনকার্য্য প্রতিষ্ঠা করে বাবর তাঁর সৈন্যদলকে দিল্লী অভিমুখে পরিচালনা করেন। সিরহিন্দ ও আম্বালার পথে বাবর অগ্রসর হলেন। এখানে তিনি শুনতে পেলেন যে সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁর বিরাট বাহিনীকে নিয়ে বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন। ক্রমে ইব্রাহিম লোদীর শিবিরের অনতিদূরেই বাবর তাঁর শিবির স্থাপন করলেন।

সুলতানের শিবিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এসে বাবর আর একবার ভারতবর্ষে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ভারতবর্ষের ভাগ্যও অনির্দ্দিষ্টভাবে অপেক্ষা করতে

লাগল এই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য। কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত করে তিনি যুদ্ধের পরামর্শসভা আহ্বান করলেন এবং সেই অনুসারে পাণিপথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া স্থির করলেন। পাণিপথের নগর অধিকার করে বাবর সেখানেই তাঁর সৈন্যব্যূহ স্থাপন করলেন।

বাবরের সেনাপতিত্বে তাঁর সৈন্যদলের গভীর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল বটে, কিন্তু এক অজানা দেশের অপরিচিত বিশাল সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে তাদের মন স্বতঃই আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের নিজেদের দেশ থেকে তারা প্রায় তিনচার মাসের পথে এসে পড়েছে। এ জাতির ভাষা তারা বোঝেনা, এদের জীবন যাত্রা প্রণালী তাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। ভারত-বর্ষের সৈন্যসংখ্যার তুলনায় তারা নিতান্ত সংখ্যা লঘিষ্ট। বিশেষ করে সহস্র সহস্র বলিষ্ঠ যুদ্ধের হস্তী রয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু সৈন্যদলের আতঙ্কের সত্যকার কোনও কারণ ছিলনা। বাবর লিখেছেন—"এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে যাঁদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করেছি তাদের তুলনায় সুলতান ইব্রাহিম কিছুই নয়। সে একজন অনভিজ্ঞ ও অসতর্ক যুবক। যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার কিছুই ছিলনা।" এ বিষয়ে বাবরের সৈন্যদলের যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর সেনাপতিদের অধিকাংশদেরই সমগ্র জীবন যুদ্ধেই অতিবাহিত হয়ে গেছে।

অবশেষে চরম যুদ্ধের ফল নির্ণীত হল ২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের রণক্ষেত্রে—সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে যেখানে বারবার ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ণয় হয়েছে। ২১শে

এপ্রিল অতি প্রত্যুষেই ইব্রাহিম শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য আদেশ দিলেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে বাবর তাঁর সৈন্যদের অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন। এদিকে ঝড়ের বেগে এসে পড়ল দিল্লীর সৈন্যদল তাদের পরে। দেখা গেল সম্মুখেই রয়েছে তুর্কী সৈন্যদের দ্বারা তৈরী গভীর খাদ সমূহ। দ্রুতগামী অশ্বে তা অতিক্রম করা শক্ত, বিশেষ তারা এজন্যে প্রস্তুত ছিলনা। তারা থমকে দাঁড়াল—এদিকে পিছনের সৈন্যদের চাপ প্রচণ্ডভাবে এসে পড়ল তাদের পরে। সৈন্যদের মধ্যে দেখা গেল বিশৃঙ্খলা। সুযোগ বুঝে মোগল সৈন্যরা দুইপাশ থেকে এসে ঘিরে ফেল্ল তাদের। এইভাবে সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে সর্ব্বত্র শত্রুসৈন্যের সঙ্গে সুরু হল সংগ্রাম। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে কে শত্রু আর আর কে মিত্র তা' চিনবার উপায় রইল না। ক্রমশঃ দেখা গেল বাবরের পরিচালনায় তুরস্ক আর মোগল সৈন্য দিল্লী সৈন্যের পরে ধীরে ধীরে জয়লাভ করছে। অবশেষে দ্বিপ্রহরের সময়ে দিল্লী সম্রাটের সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সুলতান ইব্রাহিম আহত হয়ে পড়ে গেলেন তাঁর পনের হাজার মৃত সৈন্যের পাশে। বাবরের বিজয়ী সৈন্যদল তাঁর মাথা কেটে নিয়ে এল বাবরের কাছে। বাবর লিখেছেন "সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সে যুদ্ধ সমানভাবে চলবার পর শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে গেল এবং আমার সৈন্যরা বিজয়ীর গৌরব অর্জ্জন করল। ঈশ্বরের কৃপায় এই দুরূহ কাজ আমার পক্ষে সহজ ও সরল হয়ে গেল এবং সেই বিশাল-

বাহিনী মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে গেল।"

পাণিপথের এই যুদ্ধজয়ের মূলে বাবরের অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল, সাহস, স্থৈর্য্য আর যুদ্ধনীতিই ছিল প্রধান। যুদ্ধের প্রত্যেকটি গতিবিধির পরে তাঁর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। এতটুকু বিশৃঙ্খলা বা ত্রুটী তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে দেখা যেতনা শুধু তাঁর অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ফলে। যুদ্ধ আরম্ভের সময়ে তাঁর সৈন্যদের মনে এই অজ্ঞাত জাতি সম্বন্ধে কম আশঙ্কা ছিলনা—কিন্তু বাবরের উপদেশ ও তাঁর স্থৈর্য্যই তাদের জয়লাভে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

পাণিপথ ভারতবর্ষের আফগান শক্তির সমাধি রচনা করল, তাদের সাম্রাজ্যের ধ্বংস—তাদের শক্তির শেষ পরিচয়। হতাশ ও ভগ্নহৃদয়ে তারা তাদের মৃত সুলতানের সমাধিক্ষেত্রকে এক পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করল। ক্রমে পাণিপথের রণক্ষেত্র এক বিভীষিকাময় স্থান বলে পরিগণিত হতে লাগল। রাত্রিবেলা কেউ পাণিপথের রণক্ষেত্র অতিক্রম করতে সাহস করতনা। গভীর রাত্রে নাকি করুণ আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনধ্বনি শোনা যেত সেখান থেকে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বদায়ূনী একবার পাণিপথের রণাঙ্গন রাত্রিবেলা কয়েকজন সঙ্গীসহ অতিক্রম করার সময়ে নানারকম অপ্রাকৃতিক ঘটনায় ভীষণ ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এই কাহিনী থেকে সে যুগের প্রচলিত বিশ্বাস সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। বাবর নিজেও এইসব ব্যাপার কিছু পরিমাণে বিশ্বাস করতেন।

যুদ্ধজয়ের সঙ্গেই বাবরের সৈন্যদল দুভাগে বিভক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ আগ্রা ও দিল্লী অধিকারের জন্য অগ্রসর হল। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে বাবর দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। সেই সপ্তাহেরই পবিত্র শুক্রবারে রাজধানীর বৃহত্তম মসজিদে ভারতবর্ষের প্রথম মোগল সম্রাটের নামে প্রার্থনা উচ্চারিত হ'তে লাগল। দিল্লীর সমস্ত ধনসম্পদকে সুরক্ষিত করে তিনি আগ্রা অভিমুখে দ্রুতগতিতে যাত্রা করলেন।

ইত্যবসরে হুমায়ূন আগ্রা অধিকারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানে গোয়ালিয়র দুর্গের অধিপতি বিক্রমজিতের পরিবার ছিলেন তখন। হুমায়ূন তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করেন এবং তাঁদের গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁরা হুমায়ূনকে প্রচুর মূল্যবান জহরতাদি দান করেন। সেগুলির মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হীরকখণ্ড কোহিনূর খানিও ছিল। হুমায়ূন এই মূল্যবান হীরকখানি বাবরকে দেন। বাবর আবার হুমায়ূনকেই সেখানি স্নেহের উপহার স্বরূপ দান করেন। আগ্রা দুর্গে তখন ইব্রাহিমের মাতা ছিলেন, বাবর তাঁকে সাত লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের একখানি পরগণা দান করেন। যুদ্ধশেষে বাবর তাঁর অধীনস্থ সকলকেই যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ও সম্পত্তি দান করলেন। এ ছাড়া কাবুলে তাঁর পুত্রকন্যা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও বাবর প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নানা রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান বস্ত্র, ক্রীতদাস প্রভৃতিতে তাঁর সেই উপহার সমৃদ্ধ ছিল। এ ছাড়া ফরগণা, খোরাসান, খাসগর ও পারস্যের বন্ধুদেরও তিনি ভুলে যাননি।

হিরাট, সমরখন্দ, মক্কা ও মদিনার সাধু দরবেশদেরও তিনি প্রচুরভাবে দান করেছিলেন। নিজের জন্য কিন্তু কোনও সম্পদই তিনি রাখেননি। কোনও রত্নই তাঁকে প্রলোভিত করতে পারেনি। ত্যাগী দানবীর বাবর এই জন্য 'কালন্দর' বা 'ভিক্ষু-সন্ন্যাসী' নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। ঐশ্বর্য্যের চেয়ে সুনাম ও যশকেই তিনি ভালবাসতেন বেশী।

সুলতান ইব্রাহিমের প্রাসাদেই বাবর তাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

দিল্লীর সিংহাসনে বসে সমগ্র হিন্দুস্থানের পরে বাবর তাঁর প্রভাব বিস্তার করবার কামনা পোষণ করছিলেন। তাঁর মাতৃভূমি থেকে তিনি একরকম বিতাড়িত হয়েই এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সেইজন্যে ভারতবর্ষকেই একান্তভাবে গ্রহণ করার জন্য একটা ব্যগ্র চেষ্টা তাঁর অন্তরে ছিল। বাবরের আত্মজীবনীর মধ্যে ভারতবর্ষের বিবরণ একটা বিরাট স্থান পেয়েছে। এই দেশের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিষও তিনি অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন—হিন্দুস্থান এক বিশাল দেশ, এর সম্পদ প্রচুর—অধিবাসীরা সংখ্যায় খুব বেশী। পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে সমূদ্র দ্বারা বেষ্টিত, উত্তরে বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী এবং উত্তর পশ্চিমে কাবুল গজনী আর কান্দাহার, দিল্লী হল এই মহাদেশের রাজধানী। আমার হিন্দুস্থান অভিযানের সময়ে এই বিশাল দেশে পাঁচজন মুসলমান ও দুইজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা হলেন দিল্লীর লোদী বংশ, গুজরাটের সুলতান বংশ, দক্ষিণাপথে বাহমনী বংশ, মালবের খিলজী বংশ, বঙ্গদেশের হুসেন শাহী বংশ এবং হিন্দুরাজাদের মধ্যে বিজয়নগরের হিন্দুরাজা ও চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ বা সঙ্গ।

হিন্দুস্থানকে বাবর এক আশ্চর্য্য দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। এ দেশ তাঁর চোখে এক নূতন দেশ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। এ দেশের পাহাড় পর্ব্বত নদ নদী মরুভূমি অরণ্যানি—এর সহর—

দিল্লীর দরবারে উৎসব

শস্যক্ষেত্র এর পশু পাখী—এদেশের অধিবাসী—ভাষা, এর বাতাস বৃষ্টি সমস্তই তাঁর কাছে বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে হয়েছে। হিমালয় আরাবল্লী প্রভৃতি পর্ব্বতের বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীতে; আবার নদীর মধ্যে সিন্ধু ও তার পঞ্চশাখা, গঙ্গা যমুনা শোন চম্বল প্রভৃতির কথাও তিনি উল্লেখ করে গেছেন। হিন্দুস্থানের পর্ব্বতগুলিতে তুষারের অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। কাবুলের তুষারাবৃত পাহাড়ের দৃশ্যই তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল। হিন্দুস্থানের যে বর্ণনা বাবরের কাহিনীতে পাওয়া যায় তাতে হিন্দুস্থানের পরে তাঁর খুব বেশী অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশের জনপদ তাঁর কাছে সৌন্দর্য্যহীন বলেই মনে হয়েছে। উদ্যানপ্রিয় বাবর উদ্যানের অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভব করেছেন এখানে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও হয়তো কিছুটা অনুরাগ তাঁর এদেশের পশু পাখী লতাপাতা নদী পাহাড়ের পরে ছিল নইলে তাদের কথা এমন আগ্রহের সঙ্গে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন কেন ?

তাঁর আত্মজীবনীতে পশুর মধ্যে হাতী, নীল-গাই, গণ্ডার, হরিণ. কাঠবিড়ালী প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে হাতীকে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন। হাতীর বুদ্ধির পরে তাঁর বেশ বিশ্বাস ছিল। ভারী জিনিষ বহন করা, স্রোতস্বতী নদী অতিক্রম করা, যুদ্ধের কাজে পারদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি গুণ হাতীর মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

পাখীর মধ্যে ময়ূরের বর্ণ-বৈচিত্র্য ও দেহ-সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন তিনি। এ ছাড়া তোতা, সারস, কোকিল, বন্য মোরগ

প্রভৃতি পাখীর বর্ণনাও পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। নানারকম জলজ প্রাণীর কথাও তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষীয় মাছের বেশ প্রশংসা করেছেন তাদের সুমিষ্ট স্বাদের জন্য।

ফলের মধ্যে আমের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। কাঁচা আমের চাট্‌নী ও সরবৎ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। আমকেই তিনি হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ ফল বলে স্বীকার করেছেন। আমের সঙ্গে পীচ ফলের তুলনা করেছেন তিনি। বাংলাদেশের কলার মিষ্টতা সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসার উল্লেখ আছে। বিশেষ করে কলা গাছের চওড়া সবুজ দীর্ঘ পাতাগুলি তাঁর বিশেষ ভাল লাগত দেখতে। এ ছাড়া আমলকী, খেজুর, নারিকেল, কমলালেবু প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানারকম সুস্বাদু ফলের বিবরণ লিখে গেছেন। লেবুর উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে বিষ নষ্ট করার শক্তি এর অপরিসীম।

হিন্দুস্থানের ফুলের মধ্যে বর্ষাকালের যুঁই ফুল তাঁর বিশেষ ভাল লাগত। এ ছাড়া চাঁপা, পদ্ম ও অন্যান্য নানারকম মনোহর সুগন্ধি পুষ্পের উল্লেখ করেছেন তিনি। বৎসরের ঋতু সম্বন্ধে বাবর লিখেছেন যে, ভারতবর্ষে তিনটি ঋতুই প্রধান—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। এর পরে তিনি সপ্তাহের বারের নাম, সময়-বিভাগ সম্বন্ধেও লিখেছেন।

"হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা অধিকাংশই পৌত্তলিক, তারা হিন্দু নামে পরিচিত। তাদের আকৃতি সুন্দর নয়। তারা অসামাজিক, সৌজন্যবোধ তাদের কম। এখানে আঙুর নেই, ভাল খরমুজা নেই, বরফ, শীতল পানীয় বা ভাল ঘোড়া কিছুই নেই, বাজারে রুটী নেই, খাবার নেই, উষ্ণ স্নানাগার ও কালেজ নেই—মশাল

ঝাড়লণ্ঠন কিছুই পাওয়া যায় না"। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে বাবরের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে শীতপ্রধান দেশ কাবুলের জন্য তাঁর সমস্ত মন ব্যগ্র হয়ে থাকত। হিন্দুস্থানের আর্দ্র জলবায়ু তাঁর অপ্রীতির সৃষ্টি করত।

হিন্দুস্থান সম্বন্ধে প্রশংসার বিষয় ছিল তাঁর কাছে যে এদেশ ঐশ্বর্য্য ও স্বর্ণ রৌপ্যে সমৃদ্ধ ছিল। আর ছিল একটা সুবিধা যে এদেশে কাজ করবার মত লোক যথেষ্ট পাওয়া যেত। প্রত্যেক রকম কাজের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বাবর নানা উন্নততর প্রণালীতে আগ্রার রাজপ্রাসাদকে সজ্জিত করতে লাগলেন। যমুনার জল রাজপুরীতে আনাবার নানা সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু এদেশ জয় করবার পরে বাবর যখন আগ্রায় এসে উপস্থিত হলেন তখন গ্রীষ্মকাল। আগ্রার অসহ্য উত্তাপে শীতপ্রধান কাবুলের অধিবাসীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এমন কি অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে লাগল। অসন্তুষ্ট সৈন্যরা কাবুলে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। কাবুলের শীতল হাওয়া—কাবুলের তুষারপাত তাদের আহ্বান জানাতে লাগল। বহুদিন প্রবাসী মন তাদের গৃহে ফেরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভারতবর্ষকে তারা লুণ্ঠনের ক্ষেত্ররূপেই দেখেছিল। লুণ্ঠনে অর্থ তারা পেয়েছে প্রচুর—এখন গৃহে ফিরে যাওয়াই তাদের একমাত্র কাম্য। সৈন্যদের এই অসন্তোষ বাবরের কাণে পৌঁছল—তাদের এই অবিবেচনায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। হিন্দুস্থানকে তিনি অন্য চোখে দেখেছিলেন—ভারতবর্ষকে তিনি নিজের দেশ

বলে গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেছিলেন। এমন কি তাঁর বিশ্বস্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি—খাজা কলানও দেশে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বাবর এই সময়ে সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—দুরন্ত শত্রুকে পরাজিত করে সম্পদশালী সাম্রাজ্যকে করতলগত করেছি। কিন্তু তাকে হেলায় পরিত্যাগ করে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে কাবুলে ফিরে যাওয়াই কি আমাদের ভাগ্যলিপি, আমার বন্ধুত্ব যাদের কাম্য তারা এ চিন্তাকে পরিহার কর। আমি হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করতে পারব না। সেই সঙ্গে তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন অতীতের সেই দুঃখকষ্ট ও গ্লানিকে—সেই দুঃসাহসিক অভিযান—ঝড়ের রাত্রে অবিশ্রাম তুষারপাতের মধ্যে তাদের পথচলার কাহিনী।

সৈন্যরা বাবরের এই উপদেশে লজ্জা অনুভব করল—নতশিরে মেনে নিল তাঁর কথা। কেবলমাত্র খাজা কলান তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ফিরে যেতে চাইলেন গজনীতে।

দিল্লীর প্রাচীরগাত্রে এই সময়ে তিনি লিখে রেখেছিলেন একটি কবিতা—

"নিরাপদে যদি আমি সিন্ধু অতিক্রম করে ফিরে যেতে পারি গজনীতে—হিন্দুস্থানের জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখপ্রকাশ করব না।"

বাবর প্রত্যুত্তরে নিজেকে সম্বোধন করে একটী কবিতা লিখে পাঠালেন :

হে বাবর! ঈশ্বরকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দাও—কারণ তিনিই তোমাকে সিন্ধুসহ বিশাল হিন্দুস্থান দান

হে বাবর! যদিই কখনও ভারতবর্ষের অসহ্য উত্তাপে ক্লান্ত তোমার মন কাবুলের শীতল উপত্যকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে—তবে তুমি—সেখানকার বরফ ও অবিশ্রাম তুষারপাতের কাহিনী স্মরণ করে তোমার মনকে শান্ত রেখো।

বাবরের চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে এক অপরিচিত অজানা বন্ধুহীন সাম্রাজ্যকে আপন করে নেবার আগ্রহে। এই দৃঢ়তার সুফল পাওয়া গেল শীঘ্রই। কেবলমাত্র নিজের সৈন্যদলের পরেই নয়—শত্রুর পরেও বিজয়লাভ করতে লাগলেন তিনি। লুণ্ঠনকারী দস্যু হিসাবে বাবর এ দেশের প্রত্যেকেরই বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন। তাই চারিদিক থেকে বাধা দেবার জন্য কম উদ্যোগ আয়োজন ছিল না তাদের। কিন্তু অবশেষে যখন তারা দেখল—যে বাবর হিন্দুস্থানকেই আপন আবাসস্থলরূপে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করছেন—তখন তারা ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাঁর কর্ম্মপ্রণালী লক্ষ্য করতে লাগল। তারা দেখল—বাবর মহৎ, সহৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অযাচিত দাক্ষিণ্যের। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত চিত্ত—নিয়ত রক্তপাত ও বিপ্লবে দিশাহারা ভারতবর্ষ তখন সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করছিল এক দৃঢ় ও সবল হস্তের শাসন। হিন্দুস্থানের ছোট ছোট দেশগুলি ক্রমে বাবরের প্রভুত্বকে মেনে নিতে সুরু করল। বিভিন্ন শক্তিশালী আফগান সর্দ্দারেরা তাঁর কাছে অধীনতা স্বীকার করলেন। ক্রমে হিন্দুস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলেন বাবর।

এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পাণিপথের

যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হবার পরে বাবর ইব্রাহিমের বৃদ্ধা মাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁর প্রাসাদে এনে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধা তাঁর পুত্র হত্যা-কারীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না। সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন কেমন করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন তিনি। অবশেষে সুযোগ এসে উপস্থিত হল। বাবর হিন্দুস্থানের খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। সেইজন্য সুলতান ইব্রাহিমের কয়েকজন সুদক্ষ পাচককে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর খাদ্য প্রস্তুতের জন্য। ইব্রাহিম জননী সেকথা জানতেন। খাদ্য-পরীক্ষককে প্রচুর অর্থলোভে প্রলোভিত করে বাবরের খাদ্যে বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন তিনি। পাচককেও অর্থলোভে বশীভূত করা হল। তারা বাবরের রুটী ও মাংসের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল। বাবর তার পরবর্ত্তী ঘটনাটী এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—শুক্রবারে সন্ধ্যার উপাসনার পরে তাঁর ভোজের আয়োজন করা হল। বাবর সামান্য পরিমাণে বিষমিশ্রিত মাংস আহার করার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। সহসা এইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাবরের মনে সন্দেহ দেখা দিল তিনি চিকিৎসকের দ্বারা খাদ্য পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে—খাদ্যে বিষ মেশানো রয়েছে। সন্ধান নিয়ে এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী তিনি জানতে পারলেন। বাবর সুস্থ হয়ে উঠে এই ঘটনাটি দরবারের সকলকে জানালেন। অপরাধীদের আনা হল তাঁর সম্মুখে। তাদের প্রশ্ন করে সব কথাই জানা গেল। ষড়যন্ত্র-কারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। খাদ্য পরীক্ষককে

হত্যা করা হল। পাচককে জীবন্তে গায়ের চর্ম্ম তুলে নেওয়া হল, স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজনকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলে এবং অপরজনকে বন্দুকের গুলির সাহায্যে হত্যার আদেশ দেওয়া হল।· ইব্রাহিমের জননীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। পরে ইনি কাবুলে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন বাবরের কাছে। বাবর তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কয়েকজন অনুচর সহ প্রত্যাবর্ত্তনের কালে ঝিলামের দুরন্ত স্রোতে আকস্মিক ভাবে তিনি প্রাণ হারান।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বাবর দেখতে পেলেন সে সময়ে ভারতবর্ষে তাঁর প্রধানতম শত্রু হলেন চিতোরের রাজপুত রাণা সংগ্রাম সিংহ বা রাণা সঙ্গ। পাণিপথের যুদ্ধে কেবলমাত্র আফগান শক্তিকেই তিনি পরাজিত করেছেন। অপেক্ষা করে আছে দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত শক্তি বীরশ্রেষ্ঠ রাণা সঙ্গের অধিনায়কত্বে। হিন্দুস্থানের সম্রাট হতে গেলে অবিলম্বেই তাঁর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। রাণা সঙ্গ সম্বন্ধে সমসাময়িক বিবরণ থেকে যে কাহিনী জানা যায় তাতে দেখতে পাওয়া যায় বাবরের মতই দারিদ্র্য ও দুঃখের পাঠশালায় তাঁর প্রথম পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বাল্য-জীবনের অসংখ্য বিপদ ও বাধা কাটিয়ে যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন—তখন চারিদিকেই তাঁর শক্তিমান শত্রু। সুরু হল তাঁর যুদ্ধজীবন—মালবের সুলতান মহম্মদ খিজির থেকে সুরু করে ভীলসা, সারঙ্গপুর, চান্দেরী, রণথম্বর প্রভৃতি সবগুলি দেশকেই পরাজিত করলেন তিনি। এই বীরত্বের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল—মহৎ চরিত্র ও উদার শৌর্য্যের। পরাজিত বন্দী সুলতান মহম্মদ খিলজীকে সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দিয়ে তিনি রাজপুতজাতিসুলভ ক্ষমা ও উদারতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। দুইবার দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। দুইবারই তিনি পরাজিত করেছেন তাঁকে। মারবার, অম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর,

রায়সীন, বুন্দী, রাজপুর, আবু প্রভৃতি সমস্ত রাজস্থানই ছিল তাঁর প্রভাবাধীন। রাণার দৈহিক আকৃতি ছিল তাঁর সংগ্রামময় জীবনের পরিচায়ক। সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত ছিল তাঁর শৌর্য্যের চিহ্ন—যা তিনি তাঁর বীরত্বের উপহাররূপে লাভ করেছিলেন বিভিন্ন যুদ্ধে। একটি চক্ষু তাঁর নষ্ট হয়েছিল ভ্রাতার সঙ্গে বিরোধে—দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন একখানি বাহু। অপর একটি যুদ্ধে কামানের গোলায় একখানি পা তাঁর অকর্ম্মণ্য হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া আশিটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে তরবারি বা বর্শার আঘাতে।

সঙ্গ ও বাবর—এই দুই বীর ছিলেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির। বাবর ছিলেন পশ্চিম তাতারি—তুর্ক মঙ্গোলিয়ান জাতির বংশধর তিনি—আর রাণা সঙ্গ ছিলেন ভারতবর্ষের খাঁটী আর্য্য-বংশোদ্ভূত বীর। কিন্তু উভয়েই স্বীকার করে নিতেন—উভয়ের প্রাধান্য। একের বীরত্ব ও শৌর্য্যের পরে অন্যে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বাবর ভারতবর্ষ অভিযানের পূর্ব্বেই রাণা সঙ্গের বীরত্বের কাহিনীর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে রাণা সঙ্গ তাঁর বীরত্বের পরে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন বাবরের কাছে। কেহ কেহ বলেন—সেই পত্রে নাকি বাবর এবং রাণা সঙ্গের মধ্যে এই সর্ত্তে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় যে—বাবর যখন দিল্লী আক্রমণ করবেন তখন রাণা আগ্রা আক্রমণ করবেন তাঁর রাজপুতবাহিনী নিয়ে। বাবরের অভিযোগ ছিল এই যে যখন তিনি দিল্লী ও আগ্রা আক্রমণ

করেছিলেন তখন রাণা কোনও সাহায্যই তাঁকে করেন নি। অপর দিকে রাণাও বাবরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনেন। বিয়ানা, ঢোলপুর, আগ্রা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান তাঁর প্রাপ্য ছিল—কিন্তু বাবর তাঁকে সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন এই ছিল তাঁর অভিযোগ। মোটের উপর একথা ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে বাবর ও সঙ্গের মধ্যে যে সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছিল—সামান্যতম কারণের জন্যই তা' অপেক্ষা করছিল। বিশেষ, পরাক্রান্ত রাজপুত জাতির একচ্ছত্র অধীশ্বর রাণা সঙ্গ সম্ভবতঃ এই সময়ে হিন্দুস্থানে আবার হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের গৌরবময় স্বপ্ন দেখছিলেন। ইব্রাহিম লোদীর শূন্য সিংহাসনে রাজপুত জাতির রাণার বসবার কামনা অসঙ্গত ছিল না। আফগান তুর্কী অভিযানকারীদের ভারতবর্ষ থেকে বিদূরিত করাই ছিল তাঁর প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী বিয়ানা প্রদেশের অধিকার নিয়ে সর্ব্বপ্রথম সংগ্রামের সূচনা দেখা দিল। রাণা তাঁর সৈন্যবাহিনী সহ যাত্রা করলেন বিয়ানা অধিকারের জন্য। বিয়ানার মুসলমান শাসনকর্ত্তা হিন্দুর কাছে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা বাবরের অধীনতা স্বীকার করে নেওয়াই অধিকতর সম্মানজনক স্থির করলেন। তিনি বাবরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। বাবর আর কালবিলম্ব না করে বিয়ানার সাহায্যে এক দল সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং নিজে বিপুল বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে যাত্রা করলেন রাণার উদ্দেশে। এদিকে রাজপুতবাহিনী পথে পথে বাবরের ক্ষুদ্র সৈন্যদলের পরে বিজয়লাভ করতে করতে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের এই

নূতন জয়োল্লাসে বাবরের সৈন্যদল ক্রমেই ভীত হয়ে পড়তে লাগল। বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে বাবরের আবাল্য পরিচয় ছিল। মোগলদের দুর্দ্দান্ত ঝড়ের গতিকে তিনি জানতেন —উজবেগ সৈন্যের আক্রমণে তাঁর প্রথম যৌবন ছিল বিপর্য্যস্ত, তাঁর নিজের তুর্কী সৈন্যদের শান্ত সংযত যুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়। কিন্তু এবার যাদের সঙ্গে তিনি সংগ্রামে উদ্যত তাদের নিপুণ যুদ্ধ-পদ্ধতির সঙ্গে বাবরের পরিচয় নূতন। তাদের আদর্শ, দেশপ্রেম, উদারহৃদয় ক্রমেই বাবরের সৈন্যদলের পরে প্রভাব বিস্তার করছিল।

সিক্রীতে বাবর শিবির স্থাপন করলেন। এখানে বিয়ানার সৈন্যদল এসে যোগ দিল তাঁর সঙ্গে। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে বাবরের অগ্রগামী সৈন্যদল রাজপুতদের হাতে সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত হয়েছে। ক্রমেই বাবরের সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। বাবর এই শক্তিশালী শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট সতর্কভাবে আয়োজন করতে লাগলেন। এই সময়ে সৈন্য পরিদর্শন করতে করতে সহসা বাবরের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হল। এ পর্য্যন্ত বাবর সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। কিন্তু সুরাপানের অন্যায় ও পাপ সম্বন্ধে তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই সচেতন ছিলেন। কাজেই রাণা সঙ্গের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে তিনি সুরাপান অভ্যাস ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ করে ভগবানের করুণালাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। নিজের আত্মাকে এই স্মরণীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি ভারী

সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হল এই—

হে বাবর! আর কতদিন পর্য্যন্ত পাপে তুমি তোমার আত্মাকে নিমজ্জিত রাখবে।

তুমি অনুতাপ কর তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য। আর কত দিন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকবে তুমি! পবিত্র সংগ্রাম তোমার সম্মুখে উপস্থিত।

মৃত্যু যদি ঘটে তবে মুক্তি আসবে তোমার জীবনে। সমস্ত অন্যায় কার্য্য থেকে সংযত কর তোমার মনোবৃত্তিকে। মুক্ত হও সকল পাপ থেকে। সকল প্রলোভন জয় কর—সুরাপান আজ থেকে ত্যাগ কর।

এইভাবে জীবনপণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে বাবর সুরাপান ত্যাগ করলেন। সুরাপান করবার সোনার পেয়ালাগুলি এবং পান ভোজনের অন্যান্য পাত্র গুলিকে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিলেন। সেই সোনার টুক্‌রাগুলি দরবেশ ও ফকীরদের বিতরণ করা হল। ক্রমে বাবরের এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু আমীর ও সভাসদেরা, সৈনিক অসৈনিক প্রভৃতি অনেকেই আত্মাকে সুপবিত্র করার এই ব্রত গ্রহণ করলেন। সৈন্যদের নৈরাশ্য ও অবসাদ লক্ষ্য করে তিনি এক সভা আহ্বান করে তাদের সম্বোধন করে বললেন—সৈন্যগণ—এই পৃথিবীতে যিনিই জন্মগ্রহণ করেন তাঁকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। জীবনের উৎসবে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতে আসেন তাঁদের সকলকেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হয়। জীবনের পান্থশালার সকল পথিককেই

এই দুঃখময় আবাস থেকে একদিন বিদায় নিতে হবেই! অপমানিত জীবনের গ্লানি অসহ্য—গৌরবের মৃত্যু কত বাঞ্ছনীয় মানুষের কাছে। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের পরে প্রসন্ন হয়েই আমাদের এই গৌরবময় সঙ্কটে এনেছেন। আমাদের মৃত্যু যদিই আসে সে মৃত্যু হবে ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ। আসুন পবিত্র কোরাণের নামে শপথ করি এই যুদ্ধে আমরা পরাজয়ের গ্লানি বহন করে ফিরে যাব না। শত্রুর ধ্বংস সাধনই হবে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। গৌরবের মৃত্যুই আমার কাম্য। জীবন বিনিময়ে সানন্দে আমি গৌরবকেই বরণ করে নিতে চাই।

বাবরের এই তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায় সৈন্যদের মনে সাহস ফিরে এল। তারা কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করল। এদিকে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল। প্রতিদিনই বাবরের সৈন্যদের পরাজয় কাহিনী, দুর্গের আত্মসমর্পণের সংবাদ আসতে লাগল। বাবর বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই অপেক্ষমান নীতি ভুল। অবিলম্বে রাজপুতদের অগ্রগমনে বাধা দেওয়া আবশ্যক। রাণা সঙ্গের এই বিজয়ের ফলে হিন্দুজাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে নূতন উৎসাহ ও আশার। অনেক হিন্দু সেনাপতি বাবরের পক্ষ পরিত্যাগ করে সঙ্গের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নকে তাঁরা সার্থক করে তুলবার এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা পোষণ করছেন।

অবশেষে বাবর যাত্রা সুরু করলেন তাঁর কামান ও বন্দুক নিয়ে। অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে সমান ভাবে তিনি নিজেও

ঘোড়ার পিঠে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর এই যাত্রায় সমগ্র সৈন্যদলে প্রেরণা ও উৎসাহ জেগে উঠল। বাবর তাঁর সৈন্যদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত করলেন। অশ্বারোহী সৈন্য কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যদের বিশেষভাবে ব্যূহের আকারে সাজিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর এই নূতন ধরণের ব্যূহ কৌশল প্রথম জীবনে তিনি উজবেগদের কাছে শিক্ষা করেছিলেন—খানুয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে বেলা সাড়ে নয়টার সময়ে এই অগ্রগামী দলের পরে রাজপুত অশ্বারোহীরা প্রবল বেগে আক্রমণ করল। বাবরের আদেশে এই সময়ে একসঙ্গে কামান ও বন্দুকের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ করা হল রাজপুতদের পরে। মোগল অশ্বারোহীরাও বিপুল বেগে রাজপুতদের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কামান ও বন্দুকের সম্মুখে রাজপুত সৈন্যরা দলে দলে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে লাগল। এইভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করার পরে রাজপুত সৈন্যদের অধিকাংশই গৌরবময় মৃত্যুকে বরণ করে নিল। যুদ্ধের ফলাফল তখনও অনিশ্চিত ছিল। এমন সময়ে যে রাজপুত সেনাপতির পরে সেদিনের অধিকাংশ সৈন্যদলের ভার ছিল তিনি সহসা তাঁর সমস্ত সৈন্যদলসহ বাবরের পক্ষে যোগদান করলেন। সেই মুহূর্ত্তেই রাণা সঙ্গের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সমস্ত স্বপ্নই চূর্ণ হয়ে গেল। পরাজয়ের কালিমা রাজপুতের ললাটে কলঙ্ক তিলক অঙ্কিত করে দিল। বিশ্বস্ত রাজপুত সৈন্যরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সেদিন রাণা সঙ্গকে রক্ষা করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। এর অল্প কিছুদিন পরেই ভগ্নহৃদয়ে রাণা সঙ্গ প্রাণত্যাগ করেন।

খানুয়ার যুদ্ধজয়ের পরে বাবর "গাজী" বা ধর্ম্মযুদ্ধজয়ী এই উপাধি গ্রহণ করলেন। পাণিপথের যুদ্ধে আফগান শক্তি বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল আর খানুয়ার প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে গেল রাজপুতদের দুর্ব্বার শক্তি। বাবর একচ্ছত্র অধীশ্বর রূপে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন।

ক্রমে হিমালয় থেকে সুরু করে গঙ্গা পর্য্যন্ত বাবরের আধিপত্য বিস্তৃত হল। কিন্তু তখনও বাবরের শাসন শৃঙ্খলা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুদূর প্রদেশ সমূহে তখন পর্য্যন্ত কোনও স্থায়ী শাসন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শক্তিশালী ভুস্বামীরা কেবলমাত্র নামেই বাবরের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বহুধা বিভক্ত ছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্ব্বত্য জাতিরা সম্পূর্ণ ভাবেই স্বাধীন ছিল। আফগান জাতিও কেবল মাত্র সাময়িক ভাবেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে বিহার তখন কেবল সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত।

বিহার তখন প্রবল শক্তিসম্পন্ন প্রদেশ ছিল। তখন বিহারের এক অংশ আফগান জাতির দখলে। রাজপুত জাতির সঙ্গে যখন বাবর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তখন তারা বাবরকে আক্রমণের উপযুক্ত সময় স্থির করে তাঁকে আক্রমণ করল, কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পারল না তারা। রাজপুতদের পরাজিত করার পরে বাবর তাদের শাস্তি দেবার উদ্যোগ করলেন। তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যমুনা নদী অতিক্রম করলেন। শত্রুসৈন্য

তখন গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অপেক্ষা করছিল। বাবর সেই নদীর তী
এসে পৌঁছুলেন। শত্রুদের নিকট থেকে অধিকৃত প্রায় ত্রি
চল্লিশখানি নৌকার সাহায্যে বাবর নদীর বুকে ভাসমান সে
নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। আফগানরা এই অসম্ভব কা
দেখে বাবরের উদ্দেশে নানাপ্রকার ব্যঙ্গও বিদ্রূপ করতে লাগ
কিন্তু সেতুনির্ম্মাণের কাজ ঠিকমতই চলতে লাগল। নদীর অপ
পার থেকে বাবরের গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলা ছুঁ
ছুঁড়ে সেতুর নির্ম্মাতাদের নিরাপদে রক্ষা করতে লাগল
সময়ে ওস্তাদ আলি খান্নুয়া বিজয়ী 'দিগগাজী' বা বিজয়ী কাম
থেকে দিনে ১৬বার পর্য্যন্ত গোলাবর্ষণ করেছিলেন। তখনকা
দিনে এটা কম বিস্ময়ের কথা ছিল না। তের চৌদ্দ দিনের মধ্
সেতু নির্ম্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। পরদিন বহুসংখ্যক সৈ
পার হল নদী। সেখানে রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলল দুপক্ষে
অবশেষে গভীর রাত্রে তারা আবার নদী অতিক্রম করে ফি
এল নিজেদের শিবিরে। পরের দুই দিন ধরে গোলন্দাজ বাহি
এবং সমস্ত রাজকীয় বাহিনী যুদ্ধ করল। অবশেষে এক গভী
রাত্রে গোপনে আফগান সৈন্য শিবির তুলে পলায়ন করল-
রাজকীয় বাহিনী দ্রুত অনুসরণ করল তাদের অযোধ্যা পর্য্যন্ত
পলায়িত আফগান বাহিনী এই পরাজয়ে সম্পূর্ণভাবে বিপর্য
হয়ে পড়ল—বাবর জয়ের গৌরবে মণ্ডিত হয়ে আগ্রায় প্রত্যাব
করলেন।

এর পরে বাবর ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানগুলি বিজয়ে মনো
নিবেশ করলেন। রাজপুত শক্তি চন্দেরী দুর্গে আরও এ

বাবরের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। রাণা সঙ্গের অন্যতম প্রধান সেনাপতি মেদিনী রাও এই দুর্গ রক্ষার ভার নিয়েছিলেন। বাবর যমুনা ও চম্বল অতিক্রম করে চন্দেরী দুর্গের নিকটে গিয়ে পৌঁছুলেন এবং মেদিনী রাওয়ের কাছে সন্ধির সর্ত্ত পাঠালেন। মেদিনী রাও তাঁর পাঁচ হাজার সাহসী রাজপুত সৈন্য নিয়ে দুর্গরক্ষা করছিলেন। বাবরের হীন সন্ধিসর্ত্তকে তিনি সদর্পে অগ্রাহ্য করলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ সুরু হল। প্রচণ্ড আক্রমণের পরে রাত্রিবেলা দুর্গের বাইরের অংশ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হল। প্রবল বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যখন রাজপুতদের সকল আশাই চূর্ণ হয়ে গেল তখন আপন হাতে তারা তাদের মেয়েদের ও শিশুদের হত্যা করে খোলা তরবারী নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোগল সৈন্যের পরে এবং যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুকে বরণ করে নিল। চন্দেরী দুর্গের সমস্ত প্রতিরোধের অবসান ঘটল। বাবর আগ্রায় বিজয়োল্লাসে ফিরে এলেন।

এইভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানের বৃহত্তর অংশ বাবরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। বাবর তাঁর সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করলেন। তিনি তাঁর মাতৃভূমিকে কোনও দিনই বিস্মৃত হতে পারেন নি। দেশে শাসন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পরে তাঁর সর্ব্বপ্রথম কাজ হ'ল আগ্রা থেকে কাবুল পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করা। সমস্ত পথটির দৈর্ঘ্য মেপে নিয়ে প্রতি চৌদ্দ মাইল অন্তর ২৪ ফুট উচ্চ একটা করে গম্বুজ নির্ম্মাণ করেছিলেন। আর প্রতি ষোল মাইল অন্তর স্থাপন করেছিলেন

ছয় ঘোড়ার ডাক। সেই ডাকঘরের বিভিন্ন কর্ম্মচারীর জন্য মাসিক যথেষ্ট অর্থের বরাদ্দ ছিল রাজসরকার থেকে। এই রাস্তা রক্ষার জন্য বাবর যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন সেই নিয়ম অনুসারে রাস্তার যে অংশ যে রাজ্যের ভিতর দিয়ে গেছে সেই অংশ সেই দেশের রাজার পরে রক্ষা করার ভার ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাবরের সাম্রাজ্য বিজয়ের স্বপ্ন সফল হয়ে উঠেছে। তাঁর আজীবন পরিশ্রম ও উদ্বেগের অবসান ঘটেছে এতদিনে। হিন্দুস্থানের মাটিকেই নিজের করে নেবার জন্য তাঁর মনের এক গভীর আকাঙ্খা প্রতিটি কাজে প্রকাশ পেত। কিন্তু ভারতবর্ষের জলবায়ু তাঁব শরীরে সহ্য হচ্ছিল না। তিনি প্রায়ই জ্বরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর দৃঢ় ও সবল দেহ তাঁর সারাজীবনের অত্যাচার ও পরিশ্রমে ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর এগারো বৎসর বয়স থেকে আগ্রার সম্রাট হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও পরপর দুই বৎসর এক জায়গায় রমজানের উৎসব করার সুযোগ তিনি পাননি—অর্থাৎ কোথাও একসঙ্গে তিনি দুইবৎসর থাকতে পারেন নি। ক্রমাগত দেশ থেকে দেশান্তরে পথে প্রান্তরে পর্ব্বত উপত্যকায় ছুটে বেড়িয়েই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলি তাঁর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন ক্রমেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ছিল। তবুও এই অসুস্থতার মধ্যেও তিনি তাঁর দুই বাহুতে দুইজন পূর্ণ বয়স্ক লোককে তুলে নিয়ে দুর্গ প্রাকার অতিক্রম করতে পারতেন। গঙ্গাকে কতবার সাতার দিয়ে তিনি অতিক্রম করেছেন তার ঠিক নেই। মাত্র সাতাশ বার হস্তচালনার ফলে তিনি গঙ্গা অতিক্রম করে আবার ঠিক

সেইভাবেই ফিরে আসতে পারতেন। কাবুল ও ভারতবর্ষের বহু বড় বড় নদী তিনি সাঁতার দিয়ে পার হতেন। সাঁতারে তাঁর বিশেষ আনন্দ ছিল। আর অশ্বারোহণে ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। সোজাভাবে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে একদিনে তিনি ৮০ মাইল. পর্য্যন্ত অতিক্রম করতে পারতেন—এমনই ছিল তাঁর গতিবেগ।

ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁর নিজের হাতে সৃষ্ট আগ্রার উদ্যানে এক উৎসব সভা আহ্বান করলেন। বহু বিশিষ্ট লোক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁর সেই উৎসবে। সুদূর সমরখন্দ—তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্বপ্নের সমরখন্দ থেকেও সেদিন এসেছিল রাজদূত তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে—এসেছিল তাঁর চির-শত্রু উজবেগদের প্রতিনিধি—এসেছিল পারস্যসম্রাটের প্রতিনিধি সম্রাটের অভিনন্দন বাণী নিয়ে। এই উৎসব সভায় বাবর বিশেষভাবে সম্মান দেখিয়েছিলেন তাঁর সেই সব দুঃখদিনের সঙ্গীদের যাঁরা চিরদিন তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করে এসেছে তাঁর দুর্দ্দিনের সহায়রূপে। সহস্র বিপদ ও প্রলোভনেও যারা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। তিনি বলতেন "যারা আমাকে গৃহহীন সম্পদহীন অবস্থায়ও আমার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী ছিল তাদের কথা আমি কখনও ভুলতে পারি না।"

এই উৎসবে হাতী ও উটের লড়াই, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি নানা চিত্তাকর্ষক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় যাদুকরদের যাদুবিদ্যায় বাবর অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছিলেন। সারাদিন উৎসবের পরে সন্ধ্যার সময়ে জনতাকে মুক্তহস্তে দান করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাবর এই উৎসব তাঁর চারবাগ

বাবরের আত্মজীবনী ৭৮০

উদ্যানে অনুষ্ঠান করেছিলেন। কাবুলের প্রাসাদ উদ্যানের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়েছিল এই উদ্যান। স্বচ্ছ দীঘির তীরে বিশাল শ্বেত পাথরের প্রাসাদ। কোমল গোলাপ আর নার্সিশাস ফুলে সজ্জিত সেই উদ্যান দেখে তাঁর মন ভরে উঠত তৃপ্তি ও গর্ব্বে। বাবরের এই প্রিয় উদ্যানের নাম এদেশের লোকেরা রেখেছিল 'কাবুল', মাতৃভূমির পবিত্র নামের সঙ্গে যুক্ত এই উদ্যানটি হয়তো তাঁর এত প্রিয় ছিল এই জন্যেই।

এর পরের কয়েকটা মাস আবার তাঁকে বিহারের আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। বাংলা দেশও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বাবর তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আফগান শক্তিকে পরাভূত করেন। বাংলা দেশও সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

বাবরের যুদ্ধ বিগ্রহময় জীবনের এই শেষ সংগ্রাম। এর অল্প পরেই তাঁর জীবনী লেখা তিনি বন্ধ করেন। তাঁর বিবরণীর এক জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে যুদ্ধের সময়েও শিবিরে বসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর। সেই ডায়েরীই তাঁর আত্মজীবনীরূপে পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বাবরের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি তাঁর সমস্ত পরিবারবর্গকেই কাবুলের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে হিন্দুস্থান বিজয় কার্য্যে ব্রতী হয়েছিলেন। অবশেষে যখন তিনি তাঁর একান্ত আকাঙ্খিত হিন্দুস্থানের সিংহাসন লাভ করলেন তখন তাঁর কাবুলে রেখে আসা পরিবার পরিজনের কথা মনে পড়ল।

বাবরের চারজন বেগম ছিলেন তখন—দিলদার, মাহম, গুলরুখ, এবং মুবারিক। মাহম্ ছিলেন বাবরের প্রধানা বেগম। তাঁর পুত্র হুমায়ূনই বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বাবরের পুত্রকন্যারাও তখন কাবুলে। সংগ্রাম বিজয়ী বাবরের মনে তাদের দেখবার জন্য এক প্রবল আকাঙ্খা হল। তিনি তাঁদের হিন্দুস্থানে আসবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করলেন। কিন্তু তখন কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে যাতায়াতের পথ আজকালের মত সুগম ছিলনা। পাহাড় পর্ব্বত মরু কণ্টকিত সে পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে পৌঁছুতে বাদশাহের পরিবারের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছিল। অবশেষে বেগমেরা যখন আগ্রার নিকটে এসে পৌঁছুলেন তখন বাবর আর ধৈর্য্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে পারলেন না। পদব্রজে তিনি রৌদ্রের মধ্যেই আগ্রা প্রাসাদ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য অগ্রসর হলেন। সম্রাটকে পদব্রজে অগ্রসর হতে দেখে তাঁর পত্নী মাহম অনুযোগ জানিয়েছিলেন, বাবর তার উত্তরে বলেছিলেন যে কাবুল থেকে যাঁরা আসছেন তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাই তিনি পদব্রজে এসেছেন তাঁদের আহ্বান করে নিতে। বেগমদের সঙ্গে যে সব আত্মীয়ারা এসেছিলেন কাবুল থেকে, বাবর প্রতি শুক্রবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সংবাদ নিতেন। তাঁদের সুখ সুবিধার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এমনই ছিল তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বভাব। কঠোর যুদ্ধ বিলাসী বাবরের অন্তরে যে মমতা ও স্নেহ কত প্রবল ছিল এই সামান্য ব্যাপারটি থেকেই সেকথা বুঝতে পারা যায়। সম্রাটের

সঙ্গে তাঁর প্রিয়জনদের এই সাক্ষাতের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীর বর্ণনা আছে তাঁর প্রিয় কন্যা গুলবদনের রচিত 'হুমায়ুন নামা'য়। তিনি লিখেছেন—পিতার স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে আমি এই সময়ে যে বিমল আনন্দ অনুভব করেছিলাম জীবনে তার চেয়ে বেশী আনন্দ আমি আর কখনও অনুভব করিনি।

বাবরের আত্মজীবনীর সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তার গভীর অনুরক্তি ছিল। মধ্যজীবনে যখন তিনি সুরাপানের অভ্যাস করেছিলেন অতিরিক্ত ভাবে, তখন তিনি তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে সৌন্দর্য্যকে বিশেষভাবে উপভোগ করার জন্যই তিনি সুরা ব্যবহার করতেন। যে কোনও সুন্দর দৃশ্য যে কোনও সামান্য কারণেই তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠত এবং তিনি তাঁর সঙ্গীদের উৎসব আয়োজনের আদেশ দিতেন। অনেক সময়ে তাঁর নৌকা বিহারের কথাও আমরা জানতে পাই···সিন্ধুনদের পরে ভাসমান বজরায় তাঁর আনন্দোৎসব চলেছে। তুর্কী ও পারসী ভাষায় গান হত সেখানে, নানারকম বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হত সে সব উৎসবে। কিন্তু এইসব উৎসব সমারোহে তিনি কখনও অসংযম প্রকাশ করতেন না। সৌন্দর্য্য হানিকর কোন জিনিষই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আপেল গুচ্ছের পাশে দাঁড়িয়ে হেমন্তের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের শোভা তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখতেন এবং বলতেন—কোনও চিত্রকরের নিপুণ তুলিকাতেও এর শোভা অঙ্কিত করা সম্ভবপর নয়। বাবরের মধ্যে যে একটি সুন্দর কল্পনাপ্রবণ মন বাস করত তাই তাঁকে সঙ্গীত কাব্য. ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় করে তুলেছিল।

কাবুলে একটা পাহাড়ের কাছে লাল পাথরে একটি ছোট চৌবাচ্ছা তিনি তৈরী করিয়েছিলেন। এই পাত্রটি সুরায় পরিপূর্ণ করা হত। এখানে বসে বাবর সুরাপান করতেন। তাঁকে ঘিরে উৎসব চলত। চৌবাচ্ছার গায়ে বাবরের লেখা এই কবিতাটি খোদাই করা আছে—

নব বৎসরের আগমন সুন্দর,
সুন্দরতর নব বসন্তের আবির্ভাব।
পরিপূর্ণ রসভারে নম্র সুপক্ক আঙ্গুরের গুচ্ছ।
মধুর প্রেমের সঙ্গীতে উজ্জ্বল অন্তর।

বাবর! তোমার জীবনের আনন্দকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব কর।

শুভক্ষণ অতীত হলে কোন দিনই সে আর ফিরে আসবে না।

উৎসব সমারোহের মধ্যেও শিকারের আকর্ষণ তাঁর জেগে থাকত সর্ব্বদা। উন্মত্ত খড়গ গণ্ডার কিংবা হিংস্র পার্ব্বত্য ব্যাঘ্রের পিছনে একাকী পূর্ণতেজে অশ্ব ছুটিয়ে দিতে তিনি কখনও বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় ছিল তাঁর—যখন কর্ম্মের আহ্বান তিনি শুনতে পেতেন তখন কোন কারণেই তিনি উৎসবের প্রলোভনে বশীভূত হতেন না—সৈন্য পরিচালনার সময়ে কখনও সুরা পান করতেন না। শত্রুর উপস্থিতিতে সদা জাগ্রত প্রহরীর মত সতর্ক থাকতেন তিনি। এবং যে মুহূর্ত্তে প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সেই মুহূর্ত্তেই সুরাপানের অভ্যাসকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করতে

বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। সিক্রীর কাছে যেখানে তিনি তাঁর সোণার পানপাত্রগুলি চূর্ণ করে ফেলেছিলেন সেখানে পরে একটি দানছত্র খোলা হয়েছিল দরিদ্র ও সাধুদের জন্য।

হিন্দুস্থানকেই তাঁর আপন দেশ বলে মেনে নিতে চেষ্টা করলেও মনে মনে মাতৃভূমির জন্য এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন তিনি। হিন্দুস্থানের সমতল ভূমির সবুজ সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করতে পারত না। তাঁর মনে কেবলই জাগত কাবুলের সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী—তার তুষার মণ্ডিত উজ্জ্বল শুভ্র শিখর আর ফরগণার অনবদ্য শোভাময় পুষ্প ও সুপক্ক ফলের উদ্যান। ভারতবর্ষের উদ্যানে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আঙ্গুর আর তরমুজ এনেছিলেন তাঁর মাতৃভূমি থেকে। যদি দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে তিনি থাকতেন তা'হলে হয়তো ভারতবর্ষকে ভালবাসতে পারতেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জন্মভূমিই তাঁর কাছে প্রধান ও প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছিল। তাঁর মাতৃভূমি—তার সু মিষ্ট তরমুজ তার শীতল আবহাওয়া—তাকে তিনি কোনওমতেই ভুলতে পারছিলেন না। আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তা তাঁর পুরানো বন্ধু খাজা কলানকে তিনি ১৫২৯ খৃঃ লিখেছেন—হিন্দুস্থানে অবশেষে কিছু পরিমাণে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমার বিশ্বাস সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর প্রভাবে আমাকে সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ করবেন। যে মুহূর্ত্তে হিন্দুস্থানের চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলা স্থাপন হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত্তেই আমি কাবুলে ফিরে যাব। আমার মন থেকে সেই অতীত দিনের স্মৃতি কখনও বিদূরিত হবে না। কেমন করে আমি সেই স্বর্গ

ভূমির সুমিষ্ট আঙ্গুর ও তরমুজের মধুর স্বাদ ভুলতে পারি। কয়েকদিন আগে আমার পরিজনেরা আমার জন্য একটি তরমুজ এনেছিলেন। যখন আমি সেই তরমুজটি কাটলাম—আমার সমস্ত মন মাতৃভূমির স্মৃতিতে ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমি না কেঁদে থাকতে পারলাম না।

এমনই গভীর ছিল তাঁর স্বদেশ প্রেম। কতদিন বেদনার সঙ্গে তিনি স্মরণ করতেন তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রিয় ফরগণা ও কাবুলের উন্মত্ত পাহাড়ী নদীর দুরন্ত স্রোত। তবুও নিজের পরে এমন তাঁর একটি সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি সব সময়েই নিজের মনকে সংযত রাখতে পারতেন। এই শক্তিই তাঁকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে দূরে থাকবার শক্তি জুগিয়েছিল। সুরাপান ত্যাগের ব্যাপারে তিনি বলেছেন প্রথম বৎসরে সময়ে সময়ে তিনি এর জন্য তীব্র ক্লেশ অনুভব করেছেন—কতবার তীব্র প্রলোভন তাঁর মনকে শপথ ভঙ্গ করার জন্য উত্তেজিত করেছে কিন্তু সবলে তিনি তাকে জয় করেছেন। অবশেষে ক্রমে তাঁর সকল দুঃখ ও ক্লেশ বিদূরিত হয়ে গেছে। এখন তাঁর জীবনে আর কোনই দুঃখ নেই। ঈশ্বরের কৃপায় জীবন তাঁর আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরে বাবরের গভীর অনুরাগ ছিল। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় গদ্য ও কবিতা রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। সঙ্গীতেও তাঁর বেশ অধিকার ছিল। তিনি এক নূতন ধরণের হাতের লেখার প্রবর্ত্তক, তাঁর এই লেখার ধরণটা 'খৎ-ই-বাবরী' নামে পরিচিত।

এই সময়ে সমরখন্দের সিংহাসন অধিকারের আশা আবার দেখা গিয়াছিল। বাবর সেই অভিযানের উদ্দেশ্যে পুত্র হুমায়ুনকে উৎসাহ দিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিলেন—বিপদ ও পরিশ্রমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার সময় তোমার এসেছে। অস্ত্রের সঙ্গে হোক তোমার মিতালী। প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম কর, স্মরণ রেখো রাজার সিংহাসনের সঙ্গে বিলাস ও আরামের চির শত্রুতা। উচ্চাকাঙ্খীর মনে অলসতা স্থান পায় না। পৃথিবী শক্তিমানের আয়ত্বাধীন, জীবনে সকলেই বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করতে পারে কিন্তু রাজা ও যোদ্ধার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য নেই।

চিঠিতে আরও বহু বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। কাবুলের শাসনকর্ত্তা হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরাণের সঙ্গে উদার ব্যবহার করা প্রভৃতি ব্যাপারেও তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানের বাইরে সুদূর বদাকসানের শাসনকর্ত্তারূপে থাকাতে হুমায়ুন আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন, বাবর তাঁর সে আপত্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, রাজপুত্র ও সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীর পক্ষে এ আপত্তি যে অন্যায় তাই তাঁকে জানিয়েছিলেন তিনি।

হাতের লেখার পরিচ্ছন্নতার জন্য তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। হুমায়ুনের অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখার জন্য তিনি তাঁকে তিরস্কার করে লিখেছিলেন—চিঠি লিখে যদি তুমি নিজে সেখানি পড়ে দেখবার চেষ্টা কর তাহলে দেখতে পাবে সে লেখার পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য। আমি বহু চেষ্টা করেও তোমার

পত্রের পাঠোদ্ধার করতে পারি না। বানান ভুল সম্বন্ধেও তোমার সতর্ক হওয়া উচিৎ। সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করবার চেষ্টা করবে—অর্থ যেন জটীল হয়ে না ওঠে—সেটা লেখক ও পাঠক উভয়েরই পক্ষে ক্লেশকর। এর পরে সমরখন্দের জয়ের আশা তিরোহিত হলে হুমায়ুন তাঁর পিতাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোনও সংবাদ না দিয়েই পিতার কাছে এসে উপস্থিত হন। বাবর এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন এইভাবে—"আমি তার মাতার সঙ্গে কথা বলছিলাম এই সময়ে সে গৃহে প্রবেশ করল। তার উপস্থিতিতে আমাদের হৃদয় গোলাপের কুঁড়ির মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল—চোখে দেখা দিল আনন্দের জ্যোতি।"

ক্রমে বাবরের জীবন সায়াহ্ন ঘনিয়ে এল। একদিন তাঁর পরিবার পরিজনসহ বাঘ-ই-জার আফশানের উদ্যান ভ্রমণ করার সময়ে তিনি বলে উঠলেন—রাজত্বের শাসনরশ্মি আকর্ষণ করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এইবার আমি চিরবিশ্রাম লাভ করব। এই সময়ে সম্রাটের বয়স মাত্র আটচল্লিশ বৎসর। সমস্ত জীবন দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত করে শেষ জীবনেও বাবর সুখী হতে পারেন নি। তাঁর এক পুত্র আলওয়ার মির্জ্জা এই সময়ে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এরই অল্প পরে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হয়ে আগ্রায় আসছেন। অবস্থা তাঁর অত্যন্ত সঙ্কটজনক। উদ্বেগাকুল চিত্তে বাদশাহ ও বেগম সাহেবা মথুরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়ে অসুস্থ পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। হুমায়ুনের অবস্থা তখন নিতান্তই

বিপদজনক—জীবনীশক্তিহীন কুমার প্রায় অচেতন। জীবনের কোনও আশা নেই বলে চিকিৎসকগণ অভিমত দিয়েছেন। পুত্রের এই নিদারুণ অবস্থা দেখে বাবর অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাকুলতা দেখে মাহম তাকে বলেছিলেন—সম্রাট! হুমায়ুনের জন্য আপনি এত ব্যাকুল কেন হচ্ছেন। আপনার আরও অনেক পুত্র আছে—একের জন্য এত অস্থিরতা সম্রাটের উচিত নয়। বাবর উত্তরে বল্লেন—আমার আরও পুত্র আছে সত্য কিন্তু হুমায়ূন আমার জ্যেষ্ঠ' পুত্র—আমার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আমার সমস্ত আশা তার পরেই ন্যস্ত। মুমূর্ষু হুমায়ুন নীরোগ সুখী ও দীর্ঘজীবী হোক এই-ই আমার প্রার্থনা। সে আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র —তাই তার জন্য আমার এত ব্যাকুলতা।

সম্রাট যখন এইভাবে একান্তই দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তখন একটি কথায় তিনি মনে আশার আলো দেখতে পেলেন। সে কথাটি এই যে হুমায়ুনের যে অবস্থা তাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কোনই উপায় নেই। জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা আবশ্যক। ধর্ম্মপ্রাণ, সরলবিশ্বাসী সম্রাট তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করলেন যে জীবনের তুল্য শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য জগতে আর কিছুই নেই—তিনি আত্মজীবন বিনিময়ে পুত্রের প্রাণরক্ষা করবেন। বাদশাহের হিতৈষী বন্ধুগণ এই ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি জানালেন, তাঁরা বল্লেন জাঁহাপনা, ধনরত্ন কিংবা ধনভাণ্ডার অথবা হীরক শ্রেষ্ঠ কোহিনূর পুত্রের জন্য উৎসর্গ করুন—আপনার জীবন দান করবেন না। কিন্তু বাদশাহ তাঁর

সংকল্পে স্থির ও অচল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন—আমার পুত্রের জীবনের সঙ্গে বিনিময় করতে পারি এমন কোন অমূল্য মণি দুনিয়ায় আছে ?

হুমায়ুনের রোগশয্যা পাশে বাবর এসে দাঁড়ালেন। তারপর শান্ত ও প্রসন্নমুখে শয্যা প্রদক্ষিণ করতে করতে একান্ত মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন—দয়ালু ঈশ্বর! যদি জীবন দিলে জীবন মিলে তা হলে আমি বাবর শাহ পুত্র হুমায়ুনের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করছি।

সমস্ত ঘরে নিস্তব্ধতা—সকলের প্রাণে এক গভীর আতঙ্ক ও উদ্বেগ—সহসা সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বাবর বলে উঠলেন —কণ্ঠে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর—মুখে অপার্থিব জ্যোতি—তিনি বল্লেন—আমি কৃতকার্য্য হয়েছি, আমি অনুভব করছি রোগ প্রবেশ করছে আমার দেহে—এবার আমার পুত্র সুস্থ ও নীরোগ হয়ে উঠবে। তারপর রাজ্যের প্রধানদের আহ্বান জানিয়ে তিনি হুমায়ুনকে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ও গম্ভীর স্বরে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন।

এর পরে অল্পদিনের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হল। ১৫৩০ খৃঃ ২৬ ডিসেম্বর তিনি আগ্রার চারবাগ উদ্যানপ্রাসাদে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ছত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ রাজত্বের অবসান ঘটল তাঁর। বারো বৎসর বয়সে রাজার যে কর্ত্তব্য ও দায়িত্বকে তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরের বিচিত্র ঘটনাবহুল পটভূমিকায় তাঁর সে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ ক্রমেই পূর্ণতার রূপ পেয়েছে—অবশেষে যশলক্ষ্মী পরিয়েছেন তাঁর

বাবরের সমাধি

ললাটে অক্ষয় যশতিলক। পুরুষকার তাঁর হাত ধরে ছোট ফরগণার ছোট সিংহাসন থেকে মুক্ত করে অপূর্ব্ব বিশাল ঐশ্বর্য্যশালিনী হিন্দুস্থানের মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে এনে তাঁকে বসিয়েছেন। সে রাজ্যের বিপুল সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মত পর্য্যাপ্ত অবকাশ তিনি পাননি—কিন্তু অবশেষে তাঁর সুযোগ্য পৌত্র আকবরের দৃঢ় ও সবল হাতের শাসনে তা' অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

কাবুলের উদ্যানে তাঁরই নির্ব্বাচিত স্থানে বাবরের সমাধি। কাবুলের সবচেয়ে সুন্দর স্থান সেটি। চারিদিকে তার বাবরের প্রিয় সুগন্ধি ফুলের সমারোহ—স্রোতস্বতী পাহাড়ী নদীর চঞ্চল বঙ্কিম স্রোত -যার পাশে বসে একদা তিনি এই সুন্দরী পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখতে ভালবাসতেন। আজ সেই সুন্দর পটভূমিকায় পাহাড়ের কোলে ঘুমিয়ে রইল পাহাড়ী দুরন্ত ছেলে -পিছনে ফেলে রেখে তার সমস্ত কাজের বোঝা। আজও বিদেশী পথিক এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাবরের সমাধির পাশে—নিঃশব্দে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জীবনযুদ্ধে অপরাজিত সেই শ্রেষ্ঠ সৈনিকের উদ্দেশে—মৃত্যুর আবরণ ভেদ করে চিরদিন যাঁর যশের কাহিনী জেগে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

সমাপ্ত

'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' সম্বন্ধে কয়েকখানি অভিমত

আনন্দবাজার পত্রিকা :—৪ঠা ভাদ্র, ১৩৫১,

ছেলেদের জাহাঙ্গীর :—শ্রীবাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি প্রণীত। ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিওর সত্বাধিকারী শ্রীললিত মোহন গুপ্ত কর্তৃক ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনাসম্বলিত বইখানি পড়িয়া ভাল লাগিল। এইরূপ বই বাঙলা দেশের শিশু সাহিত্যে খুব বেশী নাই ; অথচ ইহার প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। ইতিহাসের ঘটনাবলী সরলভাবে বর্ণনা করিবার শক্তি লেখিকার আছে। বই-খানিতে ছয়খানি বিভিন্ন বর্ণের চিত্তাকর্ষক ছবি আছে। ছবিগুলি সবই প্রাচীন মোগল চিত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। প্রচ্ছদপট মোগল শিল্পের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বান্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"লেখিকার সাধনা সুদূরপ্রসারী হোক এবং দেশের ছেলে-মেয়েরা দেশের সত্যকাহিনী শোনবার অবকাশ পেয়ে ধন্য হোক।" আমরাও এই অভিমত পোষণ করি।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। এই যুদ্ধের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বই বাহির করিয়া প্রকাশক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ মহাশয়—১২ই ভাদ্র, ১৩৫১,

ছেলেদের জাহাঙ্গীর বইখানিতে জাহাঙ্গীরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীমতী বাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি। ছেলেদের জন্য হলেও বড়দের কাছেও এইরূপ জীবন কাহিনীর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শ্রীমতী গুপ্তা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন—তা সত্ত্বেও বইখানি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ, কলিকাতা ও সেকেণ্ডারী টীচারস্ ট্রেণিং কলেজ, বরোদা ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়—১৪ই ভাদ্র, ১৩৫১,

বাণী মা! তোমার 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' বইখানি পেয়ে বিশেষ আনন্দ হোল। তোমরা, যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছ, যে ছেলেদের নিজ হাতে পরিবেশন করতে সুরু করেছ এ' দেশের পরম সৌভাগ্যের কথা। এতো-দিন কেবল কাল্পনিক গাল-গল্পের ফোয়ারার মধ্যে আমাদের দেশের শিশুমন স্নান করে এসেছে; কিন্তু তোমরা ইতিহাসের বাস্তব কাহিনীর মধ্য দিয়ে সত্যের কঠোর ও কমনীয় মূর্ত্তি এঁকে শিশুমন পরিস্ফুট করতে উদ্যোগী হয়েছ এতে আমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে।

বইখানির গঠন চমৎকার। ভাষা ঐতিহাসিক সংযমে সমৃদ্ধ অথচ বেগবান। কোথাও অসঙ্গতি বা অবান্তর প্রসঙ্গ নেই। তোমার গল্প বলার ভঙ্গীও অতি মনোরম,

ঘটনার স্রোত এমন স্বচ্ছন্দগতি পেয়েছে তোমার ভাষায় যে একবার বইখানি সুরু করলে শেষ না করে ওঠা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ইহা শিশুদের পক্ষে পরম লোভনীয় হবে মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব বেঙ্গলের জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ কালিদাস নাগ এম-এ, (কলি) ডি, লিট (প্যারিস) মহাশয়—১৮ই ভাদ্র, ১৩৫১,

ছেলেদের জাহাঙ্গীর বইখানি পড়ে সুখী হয়েছি। ঐতিহাসিক ঘটনা তরুণ মনে ভালরকম রেখাপাত করে না। কিন্তু লেখিকা জাহাঙ্গীর ও তাঁর যুগকে জীবন্ত করেছেন। তাঁর লিপিকুশলতার প্রশংসা করি। এ রকম বই চিত্রসম্বলিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় এবং চিত্রযোজনা ও মুদ্রাঙ্কণে লেখিকা মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাধু উদ্দেশ্য সফল হোক এই প্রার্থনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় এম-এ (কলি), ডি-লিট ও ডি ফিল (লাইডেন) মহাশয়—২০শে ভাদ্র, ১৩৫১,

কল্যাণীয়াসু—

তোমার 'ছেলেদের জাহাঙ্গী'র পড়লুম। ছাপায়, কাগজে, ছবিতে, রচনার প্রাঞ্জলতায় বইটি ভারী সুন্দর হয়েছে। ইতিহাসের তথ্য ও বিবরণ অক্ষুণ্ণ রেখে তুমি জাহাঙ্গীর কাহিনীকে বেশ সরস গল্পের রূপ দান করেছ। তোমার রচনায় জাহাঙ্গীর ও মুঘল রাজসভা সংক্রান্ত মূল

ইতিহাসের মৌলিক স্বাদও মাঝে মাঝে পেলাম, এটা তোমার কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই। মুঘল চিত্রশালা থেকে যে ছবিগুলি সংগ্রহ করে ছেপেছ সেগুলোও তোমার সুরুচির পরিচয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় সাধনে তোমার এই চেষ্টা সার্থক হোক এই কামনা করি। তোমার পরবর্তী বইয়ের অপেক্ষায় থাকবো। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টীচার্স ট্রেণিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু এম-এ, টি, ডি, (লণ্ডন)—

২০শে ভাদ্র, ১৩৫১,

ইতিহাস যে মালমশলাগুলি লইয়া রচিত হয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহাদের কিছু পরিচয় করাইয়া দেওয়া আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলায় এমন উপাদান গ্রন্থের বড় অভাব। এই জন্যই আমাদের একান্ত ভাবে পাঠ্য পুস্তকের উপরে নির্ভর করিতে হয়। ইহাতে ইতিহাসের চিত্তাকর্ষকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয় এবং শিক্ষাও সম্পূর্ণভাবে সার্থক হইতে পারে না। অথচ এই দিকে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি এখনও তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পর এখন অন্ততঃ বলা যাইবে যে মুঘলযুগের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের জন্য চিত্তাকর্ষক উপাদান গ্রন্থের অভাব সম্বন্ধে অনুযোগ করা আর চলিবে না। শ্রীমতী বাণী গুপ্ত 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' রচনা করিয়া বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক

সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাহার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা ও শিক্ষকগণ তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার বইটি রচনায়, মুদ্রণ-সৌষ্ঠবে ও চিত্র-সম্ভারে সুন্দর হইয়াছে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

সাপ্তাহিক দীপালী ২২শে ভাদ্র, ১৩৫১,

'ছেলেদের জাহাঙ্গীর'—শ্রীবাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি রচিত ও ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

ছেলেদের বই বলিতে আমরা বুঝি নানা বিষয়ক রূপকথা, গালগল্প বিস্ময়কর অসম্ভব কাহিনী অসম্ভব জীবজন্তুদের ঘটনা বা অত্যাশ্চর্য্য চমকপ্রদ ব্যাপার—অন্ততঃ এদেশে এমনি একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এগুলি মুদ্রণ পারিপাট্যে ও বিচিত্রচিত্র বাহুল্যে নয়নরঞ্জন সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার ইহাদের দ্বারা কতটা পূর্ণ হয় সেটি চিন্তার বিষয়। যাঁহারা মনে করেন ছেলেরা উপরিউক্ত ভূতপ্রেত দৈত্যদানা বা অবাস্তব রাজকুমার রাজকুমারীর কথা পড়িতে ভাল বাসে তাঁহারা ছেলেদের মনস্তত্ত্ব বা তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার কথা বিশেষ চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। ছেলেদের জ্ঞান শুধু পড়ার বই-এর মধ্যে হইতেই আসিবে—অন্য বই পড়ার ভিতর দিয়ে আসিবে না—এই মনে করিয়াই যেন সাধারণতঃ ছেলেদের বই রচিত হয়। আমি সেরূপ মনে করি না; আমার ধারণা, ছেলেদের বই রচনাই কঠিন। কারণ -

তাহাদিগকে যেমন আনন্দ দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি তাহাদের মনেও কিছু জমা দেওয়া উচিত, ভবিষ্যতে যাহা তাহারা সত্যকার কাজে লাগাইতে পারে। বইখানির নাম 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' হইলেও এখানি ছেলের পিতৃপিতৃব্য-দেরও মনোরঞ্জন করিবে, একথা জোর গলায় বলা যায়। জাহাঙ্গীরের গল্প ছেলেদের বুঝিবার মত সহজ অনাড়ম্বর ও সরল ভাষায় এমন মনোজ্ঞভাবে বলা হইয়াছে যে ছেলেরা ইহাতে গল্প পড়ার আনন্দ ত পাইবেই, অধিকন্তু তৎকালীন দেশের লোকের সমাজের ও রাষ্ট্রের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিতও পরিচিত হইবে। লেখিকার রচনায় ঐতিহাসিকের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ও নিরপেক্ষ প্রকাশ বিশেষ প্রশংসনীয়। এমন জটিল ইতিহাসকে এত সরল ভাষায় বলা বিশেষ শক্তির কাজ। বইখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার চিত্রসম্ভার। চিত্রগুলি বর্ত্তমানকালের শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত নয়, এগুলি প্রাচীন মোগল শিল্পীদের অঙ্কিত মূল চিত্রেরই প্রতিলিপি। এ হিসাবে চিত্রগুলিরও বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমি শ্রীমতী বাণীকে শিশু-সাহিত্যে সত্যকার গল্প শোনাইতে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলএর গ্রন্থগারিক ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের সহকারী কর্ম্মসচিব—শ্রীযুক্ত সরসী কুমার সরস্বতী এম, এ মহাশয়—২৩শে ভাদ্র, ১৩৫১।

শ্রীমতী বাণী গুপ্তার 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। সহজ ও সরস ভাষায় শিশুমনের

প্রয়োজনের দিকে নজর রাখিয়া তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। ইতিহাসের আকর্ষণ মানুষের মনে স্বাভাবিক।··ছেলেদের মনে ইতিহাস শোনবার আকাঙ্ক্ষা রূপকথা শোনবার আকাঙ্ক্ষার চাইতে কম নয়। ইতিহাস ক্ষুণ্ণ না করেও সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যায়। শ্রীমতী বাণী সে ব্রত গ্রহণ করেছেন। এই প্রথম পুস্তকখানিতে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়াছেন, তাঁর ব্রত যে সফল হবে তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি নিয়ে তিনি আরও আলোচনা করবেন জানিয়েছেন। তাঁর সে প্রয়াস সার্থক হবে আশাকরি। ছেলেদের মনে দেশের ইতিহাস জানবার স্পৃহা বাড়িয়ে তুলবে, এই হবে তাঁর ব্রতের পুরস্কার।

ছেলেরা যে বইখানিকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তার প্রমাণ আমার ছেলে বইখানা একটানা শেষ করেছে বইখানা পড়ে আমিও কম আনন্দ পাইনি।

যুগান্তর পত্রিকা—২৫শে ভাদ্র,১৩৫১,

ছেলেদের জাহাঙ্গীর :—শ্রীবাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি প্রণীত। ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত আলোচ্য বইখানিতে লেখিকা সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের তথ্য ও বিবরণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গল্প বলার মনোরম ভঙ্গীতে মুঘল যুগের

ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তিনি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। বইখানির ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল। ছেলেদের জন্য হইলেও বড়দের কাছেও এইরূপ পুস্তকের মূল্য কম নহে। বইখানির গঠন সুন্দর, ছাঁপায় কাগজে ও প্রাচীন মুঘল চিত্রসম্ভারে বইখানি সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদপট মার্জিত রুচির পরিচায়ক।

Amrita Bazar Patrika—4th Aswin, 1351.

Chheleder Jahangir. By Sm. Bani Gupta, M.A., B T., Pnblished by Lalit Mohan Gupta, 72-1. College Street, Calcutta. In Bengali. Rs 2.

Jehangir is one of the most colourful personalities of Indian history and an account of his life cannot fail to be of interest to all readers. Though Sm. Bani Gupta writes this fascinating biography for the juveniles, her simply and charmingly written volume will be read with avidity by adults too. Handsomely illustrated and got up and excellently printed, it is a fine book for presentation. Original Mughal paintings have been utilized and the superb multi-colour reproduction of a joyous festival in the court of Jehangir deserves high praise. In the writing of the account, Sm. Bani Gupta has utilized memoirs of Jehangir, Sir Thomas Roe's 'Journal' and Prof. Bani Prasad's 'Jahangir'. We will be eagerly looking forward to the publication of similar volumes on other noted historical personalities by the same authoress.

সাপ্তাহিক দেশ—২১শে আশ্বিন—১৩৫১,

ছেলেদের জাহাঙ্গীর—শ্রীবাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীললিত মোহন গুপ্ত কর্তৃক, ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা

সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবন কথা গল্পের ভাষায় বলা হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা এই পুস্তক পাঠ করিলে মোগল ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারিবে। কয়েকখানা সুন্দর চিত্র থাকাতে বইখানা ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ আকর্ষনীয় হইয়াছে।

প্রবাসী—আশ্বিন—১৩৫১,

ছেলেদের জাহাঙ্গীর—শ্রীবাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি। ভারত ফোটাটাইপ ষ্টুডিওর সত্বাধিকারী শ্রীললিত মোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক মূল্য সত্ত্বেও নানাকারণে ইতিহাসের বই প্রায়শই সাধারণ পাঠকের রুচিকর হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। লেখিকা গল্পের আকারে জাহাঙ্গীরের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন অথচ ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ইতিহাসের বই হইলেও ইহা সাহিত্যিক রসে পরিপূর্ণ। এবং ইহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক মাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। লেখিকা বোধ হয় বিনয় সহকারে বইখানিকে ছেলেদের পাঠ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস বয়স্করাও ইহা পড়িলে সুখী হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ হেমচন্দ্র রায় এম, এ, (কলিকাতা) পি, এইচ, ডি (লণ্ডন) ডি, লিট (লণ্ডন) মহাশয়—৩০শে আশ্বিন ১৩৫১

শারদীয় উৎসবে কলিকাতায় এসে কুমারী বাণীর পরিকল্পিত পুস্তকমালার প্রথম সৃষ্টি 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' দেখে পরম আনন্দিত হয়েছি। আশাকরি শ্রীমতী বাণীর এই সাধনা সফল হবে এবং শীঘ্রই আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের ইতিহাস সম্বন্ধে বর্তমান ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হবে।

শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৫১,

শ্রীবাণী গুপ্ত সচিত্র 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' লিখিয়া এক সঙ্গে অভিভাবকদের ও ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ, ডি মহাশয়—২২শে কার্ত্তিক, ১৩৫১।

শ্রীযুক্তা বাণী গুপ্ত লিখিত 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' বইখানি পড়িয়া সত্যই আনন্দ লাভ করিয়াছি। বইখানি পড়িয়া প্রথমেই মনে হইয়াছে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে এ জিনিষ খানিকটা নূতন। ইতিহাসের তথ্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিবার চেষ্টাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। তাহাতে লাভ দুইদিকে। গল্প সাহিত্যের মারফতে ইতিহাসের তথ্য পরিবেশনও সহজ এবং সরল হইল, আবার ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণের ফলে গল্প সাহিত্যেরও বৈচিত্র্য সম্পাদন হইল। লেখিকার

উদ্দেশ্যই শুধু মহৎ নহে, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট। জাহাঙ্গীরের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া লেখিকা ইতিহাসের পটভূমির উপরে যথেচ্ছ কল্পনার তুলি চালান নাই,—আবার গল্পের সরল স্বচ্ছন্দ গতি ঐতিহাসিক তথ্যের উপলখণ্ডে কোথাও ব্যাহত হয় নাই। গ্রন্থারম্ভে লেখিকা বলিয়াছেন "ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল শাসন এক বিরাট অধ্যায়। তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা, তার রাজ্য-শাসনপদ্ধতি দেশকে উন্নতির পথে পরিচালনা করেছে। বাংলা দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সেই গৌরবময় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার আকাঙ্খা নিয়েই 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' প্রকাশ করার উদ্যোগ করা হয়েছে। এই পর্য্যায়ের আরও কয়েক-খানি বই প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। আলোচ্য বইখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং সাহিত্যবোধ দুই-ই প্রখর। সুতরাং আশা করি, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প সাধনের দ্বারা ইতিহাস এবং সাহিত্য উভয়েরই সেবা করিতে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি, আর, এস মহাশয়—৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১,

"ছেলেদের জাহাঙ্গীর" পড়িয়া ভাল লাগিল। ঘটনার ধারা অতি নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে। বর্ণনার বিষয় ও বর্ণনার ভঙ্গী দুই-ই সুন্দর। শুধু 'ছেলেদের' নয় বড়দেরও ইহা ভাল লাগিবে; কারণ ইহাতে ভাল লাগাইবার আয়োজনের ক্রটী হয় নাই—যেমন ছাপা; তেমনই ছবি; তেমনই বিষয় আলোচনার রীতি; সর্ব্বত্রই পরিপাটির চিহ্ন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ, মহাশয়—

বইখানি পড়ে সত্যই আনন্দলাভ করলাম। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়ে ছেলেমেয়েরা মোগল বাদশাদের যে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক জীবন। তার ভিতর দিয়ে আমরা লাভ করি একটি মুখোসপরা মানুষকে।

এই মুখোসের আড়ালে যে গোপন মানুষ তার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা; তার স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, ভুল-ভ্রান্তি, দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়ে আপনার অন্তরঙ্গ পরিচয়টুকু গোপনে বহন করে চলেছে, সেই গোপনচারী একক মানুষটির পরিচয় আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে অজানাই থেকে যায়।

অথচ সম্রাটের জীবন শুধু ব্যক্তিগতও নয়, আবার শুধু রাষ্ট্রগতও নয়। এই দু'য়ের সংঘাতে গড়ে ওঠে তার সত্যকার জীবন। কেউ কেউ তাঁদের জীবনে এই দু'য়ের সমন্বয় সাধন করতে পেরেছেন তাঁরাই হয়েছেন ইতিহাস স্মরেণ্য; আবার কেউ কেউ এ দু'য়ের সমন্বয় সাধন করে যেতে পারেননি তাঁদের জীবনে তাঁরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শুধু নামেই টিকে রয়েছেন।

লেখিকা মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনের এই দুইটি দিকই আমাদের ছেলেমেয়েদের চোখের সম্মুখে মেলে ধরেছেন—ঝরঝরে ভাষায় সুন্দর ভঙ্গিতে। পড়তে পড়তে মনেই হয় না ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একটি কাজের বই পড়ছি।

বলার মত করে বলতে পারলে সত্য কথাও যে পরম চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে; আলোচ্যগ্রন্থের লেখিকা সেটা অনায়াসে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষা ঠিক ইতিহাসের ভাষাও নয়—আবার ঠিক গল্পের ভাষাও নয়—এ ভাষাকে বলা যেতে পারে গল্পাকারে ইতিহাস বলার ভাষা।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আগাগোড়া এই ভাষা বজায় রেখে চলা সহজ নয়। লেখিকা যে এই কঠিন কাজটি এত সহজে সুসম্পন্ন করতে পেরেছেন—সে জন্যে তাঁকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা জানাচ্ছি।

বইখানি পড়ে শুধু ছেলেমেয়েরাই নয়, তাদের বাপ-দাদারাও উপকৃত হবেন।

অধ্যক্ষ, আশুতোষ চিত্রশালা ও অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম, এ, মহাশয়—

শিশুসাহিত্যের নামে ভৌতিক গল্প ও রোমাঞ্চকর কাহিনী আজকালকার বাজার ছেয়ে গেছে। সত্যিকারের ঐতিহাসিক গল্প যে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয় কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাণী গুপ্ত 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' বই-খানিতে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন। এই ধরণের বই ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে পড়া দরকার।

শাহানশাহ জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও জীবন মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাসে এক বৈচিত্র্যময় আলো-ছায়াপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। রূপরসিক সুন্দরের পূজারী জাহাঙ্গীরের স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে চিরকাল

অমলিন হয়ে থাকবে। শ্রীমতী বাণী ঐতিহাসিক তথ্য-গুলিকে সুললিত ভাষায় রূপান্তরিত করে এক অপূর্ব্ব চরিত্র-চিত্র ধরেছেন ছোটদের সামনে। বইখানি চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ। ছাপা ও বাঁধাই প্রকাশকের শিল্পীমনের পরিচায়ক। আশা করি ছোট বড় সকলের কাছেই বই-খানি সমাদৃত হবে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর অব্ মেডিসিন ডাঃ [illegible] দে—এম, বি, এম, আর, সি, পি, (লণ্ডন) মহাশয়—১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫১

বাল্যজীবনে আমি ইতিহাসের বই পড়তে বড়ই ভাল-বাসতাম। কিন্তু বাংলা ইতিহাসের বই পড়ে বেশী আনন্দ পেতাম না কারণ তার লিখন প্রণালী চিত্তাকর্ষক বলে মনে হত না। কেবল কতকগুলি বড় বড় তারিখ আর নীরস matter of facts পড়তে কখনই ভাল লাগেনা। বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। কাজেই মুখস্থ বিস্তারই প্রসাধন হতে থাকে। হঠাৎ বাণী দেবীর 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' বইখানি হাতে পড়ায় আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। একটানে বই খানিকে শেষ করে ফেল্লাম এবং মনে ভারী আনন্দ পেলাম। মনে হল বইখানি বাংলা ইতিহাসের জগতে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে। আমার বিশ্বাস ছোট ছেলেদের ইতিহাস গল্পচ্ছলে এই ভাবেই পড়ানো সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি সঙ্গত। আমি নিজে আজ ২৫ বৎসর কাল বালকদের শিক্ষা দিচ্ছি এবং শিক্ষা প্রণালী কি হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা

লাভ করেছি। আমার ধারণা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এবং প্রতি ঘরে ঘরে বাণী দেবীর 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' বইখানি পাঠ্য পুস্তক রূপে গ্রহণ করে ছেলেদের ইতিহাস শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা উচিৎ। আশাকরি বাণী দেবী এইরূপ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করে আমাদের বালক বালিকাদের কাছে চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী—কার্ত্তিক, ১৩৫১,

'ছেলেদের জাহাঙ্গীর'—শ্রীমতী বাণী গুপ্ত এম-এ বি-টি, প্রকাশক ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিওর সত্বাধিকারী শ্রীললিত মোহন গুপ্ত। ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট। মূল্য দুই টাকা। ১৩৫১—প্রথম প্রকাশ।

ছেলেমেয়েদের গল্প ও উপকথার বই বাংলায় অনেক আছে; কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাসের কথা লইয়া গল্প লেখা খুব কম হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে লেখিকা সরল ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পুস্তকখানি লিখিয়া যেমন উপকার করিয়াছেন—তেমনই বাংলার শিশু-সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। দেশের ছেলেমেয়েরা দেশের সত্যকাহিনী শোনবার অবকাশ পেয়ে ধন্য হবে। স্বাধীন ভারতের বীরত্ব ও রাজ্য শাসনের কথা জেনে অনুপ্রাণিত হবে। বইখানির কাগজ, বাঁধাই, ছাপা ও চিত্র অতি সুন্দর ও লোভনীয়। এই শিক্ষিতা ও সুলেখিকার উদ্যম জয়যুক্ত হোক।

The Modern Review—January, 1945.

Chheleder Jehangir—By Srimati Bani Gupta, M.A., B.T., with a Preface by

Brojendra Nath Banerjee. Published by Lalit Mohan Gupta, 72-1, College Street, Calcutta, Illustrated. Price Rs. 2.

Among the Moghul Emperors, Jehangir's was a most romantic life and it aroused the curiosity of the people of different ages. The authoress has presented this romantic career in a way suitable for our juvenile readers. The style is easy and lucid. Apart from its valuable contents, the illustrations of the book are a great attraction for the reader. The fronticepiece is of four colours, and the inside pictures are printed in one but distinct colours. And all of these are reproductions of first class Mughal paintings. We should congratulate both the authoress and the publisher for producing the book in such a beautiful and great way.

Jogesh Chandra Bagal.

গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া প্রেসের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভবানী সেনগুপ্ত বি-এস-সি মহাশয়—২৫শে মাঘ ১৩৫১।

বইখানি আমার একাধিক কারণে বিশেষ ভাল লেগেছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্তে বই কিনতে গিয়ে বহুদিন আমার মনে হয়েছে অন্যান্য ভাষার এই জাতীয় পুস্তকের তুলনায় আমাদের মাতৃভাষার পুস্তকের দৈন্য না হ'লেও অভাব রয়েছে এখনও যথেষ্ট। বাণী দেবীর এই বইখানি

এবং পরে যেগুলি আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—আশাকরি আমাদের ছোটদের সেই অভাব অনেকটা পূর্ণ করবে। ইতিহাসের গল্পের পরে যে তাদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে তা' আমাদের অনেকেরই জানা আছে। তাই তারা যে এই বইগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করবে—সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের শিশুদের তরফ থেকে আশা করছি ও লেখিকাকে অনুরোধ করছি যে এই বইখানির শেষে দেওয়া তালিকাভুক্ত বইগুলি শেষ করেই যেন তিনি কলম বন্ধ না করেন তাতে তারা ক্ষুণ্ণ হবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলেন ঘোষাল, এম-এ মহাশয়—৮ই ফাল্গুন ১৩৫১।

বাণী, তোমার লেখা 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' পড়লাম, বেশ লাগল।

ইতিহাস লেখার ধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ইতিহাস আর শুধু ঘটনা বা তারিখ পঞ্জিকা নয়। বিভিন্ন ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের সৃষ্টি। সমষ্টির মনোভাব ফুটে ওঠে ইতিহাসের পাতায়।

মোগল রাজত্বের ইতিহাস ব্যক্তিগত ইতিহাস। তার সঙ্গে জাতির জীবনের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সম্রাট-পুত্রদের আত্মকলহের মধ্যে ছিল শুধু তাদের সিংহাসনের লোভ, রাজত্বের মোহ। তার মধ্যে আদর্শের কোন স্থান ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই ভাবচ্ছটাহীন ঔজ্জ্বল্যের কাহিনী তুমি বড় সুন্দর ভাবে লিখেছ।

'ছেলেদের জাহাঙ্গীর, ছেলেদের অভিভাবকদের কাছেও আদরণীয় হবে।

তোমার পরবর্ত্তী বইয়ের আশায় থাকলাম।

সুসাহিত্যিক সাংবাদিক কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যবিনোদ মহাশয়—৯ই ফাল্গুন, ১৩৫১।

শিশু-সাহিত্যের নামে প্রচলিত অসম্ভব গালগল্প ও 'এ্যাডভেঞ্চার' কিছুকাল থেকে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মনকে পেয়ে বসেছে। তাদের কল্পনাকে দূর-প্রসারী করে' ভাবপ্রবণ মন ও সুকুমার মতিকে আয়ত্বে আনার দায়িত্ব আছে শিশু-সাহিত্যের কিন্তু অবাস্তব ও অসম্ভব ঘটনা সংস্থানে শিশুর মানসিক সংগঠনকে তার স্বাভাবিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনকে আমরা একদিক দিয়ে এড়িয়েই চলেছি। ভারতের বিচিত্র ঘটনাবহুল ইতিহাসের কথা আজ পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে কোথাও বিকৃত, কোথাও বা অসম্বদ্ধ অথচ ছেলেদের মনের উৎকর্ষ ও চরিত্রের দৃঢ়তার প্রধানতম ভিত্তি হল দেশের অবিকৃত ইতিহাস। অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য সুখপাঠ্য, সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের নানাবিধ সংস্করণ দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় চরিত্র-গঠনে এর সার্থকতার পরিমাণ অনেকখানি।

কল্যাণীয়া শ্রীবাণী গুপ্ত সম্পূর্ণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' লিখেছেন। তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী এবং বিদুষী। ইতিহাসই তাঁর গবেষণার বিষয়। কাজেই ইতিহাস লেখার যোগ্যতা

ও অধিকার তাঁর আছে এবং তার প্রকৃত মর্য্যাদা যে তিনি রক্ষা করেছেন, বইখানি পড়ার পরে একথা আমি জোর করেই বলতে পারি। সরল সাবলীল তাঁর ভাষা, বিষয়-বস্তুর বিন্যাস অতি সুন্দর। ঘটনার পর ঘটনাকে এমন-ভাবে তিনি সাজিয়ে গেছেন যে মনে হয় গল্পের বই পড়ছি। কোথাও এতটুকু বাধে না বা ক্লান্তি আসে না।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে তথা শিশুসাহিত্যে এমন সুন্দর ও সুলিখিত বই-এর বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেই হিসাবে বইখানির যথেষ্ট সমাদর হবে এ ভরসা আমার আছে।

এই ধরণের আরো অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বই তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য লিখবেন বা ইতিপূর্ব্বেই লিখতে আরম্ভ করেছেন শুনেছি। তাঁর সে চেষ্টা জয়যুক্ত হোক এই আশীর্ব্বাদ আমি তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে করছি।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর অব প্যাথোলজি অ্যাণ্ড ব্যাক্টেরিওলজিষ্ট টু দি গভমেণ্ট অব বেঙ্গল, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ত্রিবেদী মহাশয়, এম, বি (কলিঃ); ডি, বি (লণ্ডন)

ছেলেবেলায় স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহোদয়ের 'ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত' পাঠে খুবই আনন্দ পাইতাম। লেখকের বর্ণনার কুশলতা এমনই মধুর যে এই প্রৌঢ় বয়সেও মধ্যে মধ্যে "ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত" পড়িতে বসি। কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাণী গুপ্তের 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' আমাকে ঐ প্রকারই আনন্দ দিয়াছে। আশাকরি ইহা ছেলেদের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় পাঠ্য হইবে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়—২১শে চৈত্র, ১৩৫১।

কল্যাণীয়াসু

তোমার "ছেলেদের জাহাঙ্গীর" তুমি আমাকে অনেকদিন হোলো উপহার পাঠিয়েছ, আমি শুধু কুড়েমি করে তোমাকে আমার সকৃতজ্ঞ স্বীকার জানাতে পারিনি, আশাকরি সেজন্য অপরাধ নাও নি।

তোমার বইখানি আমার ভালো লেগেছে কেন না বইখানি সত্যিই ভালো হয়েছে। আমি ঐতিহাসিক নই কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র, কিছু চর্চ্চাও করেছি, মোগল ইতিহাসের কিছু খবরও রাখি—তাই বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে তুমি ছেলেদের জন্য জাহাঙ্গীর বাদশার যে গল্পগুলি রচনা করেছ তার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রক্ষা যেমন করেছ, তার ভাষাটির মর্য্যাদাও দিয়েছ তেমনি। ঝরঝরে ঝকঝকে বইখানি হয়েছে তোমার সকল দিক থেকে।

তোমার বাবা আর দাদা জানেন আমি তোমাদের ব্লকের আর ছবি ছাপার কাজের একজন সত্যিকার সমঝদার। তোমার বইটিতে তাঁদের কাজের পরিচয় রয়েছে পাতায় পাতায় উজ্জ্বল হয়ে। বইখানি পড়বার আগেই চোখ জুড়োয় ছবিগুলি দেখে, মন হয় খুসী।

তোমার কাছে এই রকম বই আরো চাই, চুপ করে গেলে চলবে না।

'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' সম্বন্ধে প্রবীণ ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিমত—

প্রথম ছয়জন দিল্লীর বাদশা প্রত্যেকেই অসামান্য চরিত্রের লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের জীবনের ঘটনাগুলি বরং উপন্যাস হইবার উপযুক্ত এত আশ্চর্য ছিল। তাঁহাদের সত্য ইতিহাসই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে থাকে। আর, তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র অপর ক'জনের চরিত্র হইতে বিভিন্ন, প্রবল বিশেষত্ব দ্বারা চিহ্নিত। এঁদের মধ্যে শুধু বাবর এবং জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়ে আমরা যেন তাঁদের চোখের সামনে জীবন্ত মানুষের মত দেখি। সব ঐতিহাসিক সত্য নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া শ্রীমতী বাণী গুপ্ত যে ছোট ছোট মনোরম বাদশা জীবনীগুলি লিখিতেছে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে বহুদিন আদর পাইবে বলিয়া আশা করি। ছেলেমেয়েরা এসব "সত্যগল্প" পড়িয়া একসঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিবে!

লেখিকার পরবর্ত্তী বই

ছেলেদের হুমায়ুন

ছেলেদের আকবর

ছেলেদের শাহজাহান

ছেলেদের ঔরঙ্গজেব

সিংহল কুমারী পদ্মিনী

মালব রূপসী রূপমতী

কালিদাসের নারীচিত্র

ছেলেদের অশোক

ছেলেদের শিবাজী